বড়দিন সংখ্যা
২০২০ খ্রিস্টাব্দ
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

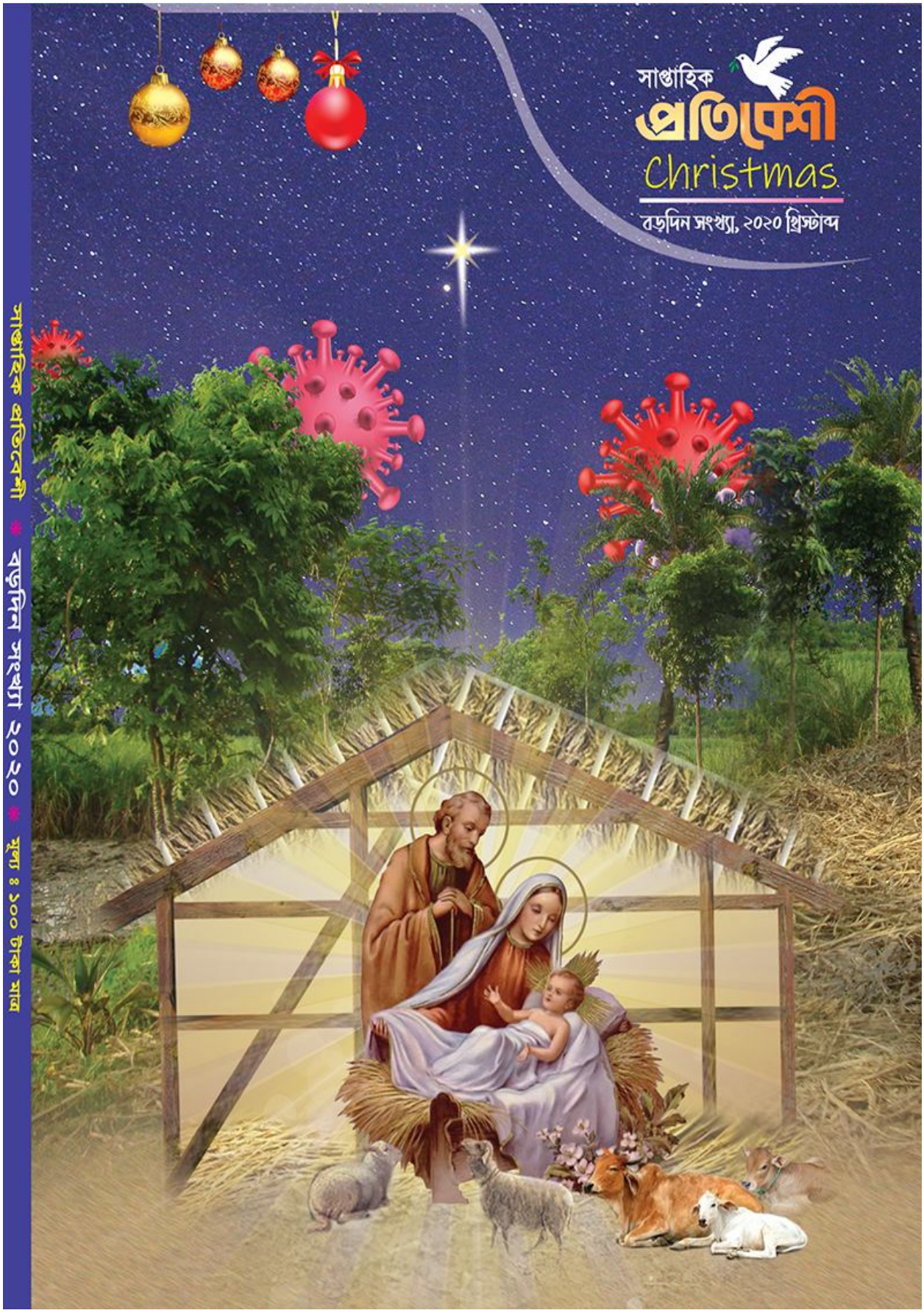
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
Christmas
বড়দিন সংখ্যা, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী * বড়দিন সংখ্যা ২০২০ * মূল্য ঃ ১০০ টাকা মাত্র

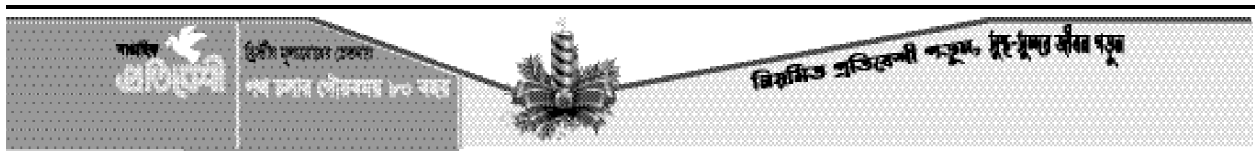
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

বছর ঘুরে আবারো এলো আমাদের
ত্রাণকর্তা প্রভু যিশু খ্রিষ্টের শুভ
জন্মতিথি। করোনা ভাইরাসের
বৈশ্বিক মহামারীর কারণে
এইবারের বড়দিন একটু ভিন্ন
তাৎপর্য বয়ে আনে আমাদের
প্রত্যেক পরিবারে।
পাপমুক্ত ও ভালবাসার হৃদয় নিয়ে
আমরা যেন প্রভু যিশুকে আমাদের
অন্তরে
সর্বদা ধারণ
করতে পারি।

শান্তি ও আনন্দের ঢেউ বয়ে যাক আমাদের পরিবারে। হিংসা, অহংকার, স্বার্থপরতা ত্যাগ করে আমরা যেন একে অপরকে ভালবাসি এবং খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসে সুন্দর ও সত্য পথে জীবন-যাপন করি।

সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

বটলেরো পরিবারের
পক্ষ থেকে
সবাইকে জানাই
বড়দিনের
প্রীতি
ও
শুভেচ্ছা -

ডাঃ রোজলিন বটলেরো
মেলবোর্ন-অস্ট্রেলিয়া

নিয়মিত প্রতিবেশী পড়ুন, সুস্থ-সুন্দর জীবন গড়ুন
খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধের চেতনায়
পথ চলার গৌরবময় ৮০ বছর
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

- বড়দিন : বিশ্বভ্রাতৃত্বের উৎসব - ***বিশপ জের্ভাস রোজারিও*** • ৮
- যিশু খ্রিস্টের দেহধারণ : প্রৈরিতিক চেতনার জাগরণ - ***ফাদার নরেন জে বৈদ্য*** • ১১
- গোশাল ঘর থেকে নেয়া বড়দিনের বাণী - ***ফাদার অরুণ উইলিয়াম রোজারিও ওএমআই*** • ১৩
- বড়দিন বড় হবার দিন - ***ডঃ সিস্টার মেরী হেনরীয়েটা এসএমআরএ*** • ১৫
- যিশুর দেহধারণ : নিস্ব হয়ে পূর্ণ হওয়া - ***বিশপ থিয়োটনিয়াস সিএসসি*** • ১৬
- বড়দিনের আনন্দময় ধর্মতত্ত্ব : ঐশমানবিকতা - ***ড. ফাদার তপন ডি'রোজারিও*** • ১৮
- অভিবাসী, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি ও প্রান্তিকজনের পাশে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী : পরিপ্রেক্ষিত কারিতাস বাংলাদেশ - ***জেমস গোমেজ*** • ২০
- বড়দিন : বাংলার ঘরে-ঘরে সঙ্গীত ও সুরে - ***ফাদার সুনীল ডানিয়েল রোজারিও*** • ২৯
- শিশু যিশুর পরিবার ও আমাদের পরিবার - ***সিস্টার মেবেল রোজারিও এসসি*** • ৩১
- যিশুর দেহধারণ কৃষ্টি থেকে কৃষ্টিতে পরিপ্রেক্ষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম - ***ফাদার রবার্ট গনসালভেছ*** • ৩২
- বড়দিন : এক আনন্দময় অনুষ্ঠান ও আনন্দমুখর দিন - ***কামনা কস্তা*** • ৩৪
- বাংলাদেশে খ্রিস্টান কীর্তনগাথার ইতিকথা: বিশ্বের Christmas Carol এর ইতিবৃত্ত ও 'Silent Night'. - ***ডাঃ নেভেল ডি'রোজারিও*** • ৩৫
- সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে - ***ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি*** • ৩৭
- আনন্দময় হোক সবার জীবন : শুভ বড়দিন ২০২০ - ***দাউদ জীবন দাশ*** • ৩৯
- আজ স্বর্গীয় আলোয় উজ্জ্বল ধরণী - ***সিস্টার মেরী সান্তনী এসএমআরএ*** • ৪০
- বড়দিনের মজা - ***ফাদার আলবার্ট রোজারিও*** • ৪১
- বড়দিনের বৈঠক - ***সিস্টার মেরী প্রফুল্ল এসএমআরএ*** • ৪২
- স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম বড়দিন - ***ফাদার আবেল বি রোজারিও*** • ৪৩
- আঠারোগ্রামের কাঙ্ক্ষিত বড়দিন - ***এরশাদ আল মামুন*** • ৪৫
- সান্তাল কৃষ্টিতে বড়দিন - ***আলবেনুস সরেন*** • ৪৬
- মফস্বলে বড়দিন অভিজ্ঞতা - ***ফাদার প্রশান্ত এল গমেজ*** • ৪৮

খোলা জানালা

- বঙ্গ থেকে বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ - ***সুনীল পেরেরা*** • ৪৯
- এফএবিসি ও বাংলাদেশ মণ্ডলীতে এর প্রভাব - ***ফাদার ইম্মানুয়েল কে রোজারিও*** • ৫২
- সামাজিক মূল্যবোধ গঠনে যোগাযোগ মাধ্যম - ***ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ*** • ৫৫
- মণ্ডলীতে এক আদর্শ কর্ণধার আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী - ***ফাদার হিউবার্ট গমেজ*** • ৫৭
- যাজকতন্ত্র ও পোপ ফ্রান্সিস - ***যেরোম ডি'কস্তা*** • ৬১
- সামাজিক অবক্ষয়: দায় কার - ***ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি*** • ৬৪
- ধরিত্রি রক্ষায় আমাদের করণীয় - ***অর্পা কুজুর*** • ৬৬
- আমার দায় : প্রসঙ্গ সমবায় সমিতি - ***অমিয় জেমস এসেনসন*** • ৬৭
- কথার কথা - ***কাজল সামুয়েল গমেজ*** • ৬৮
- নোভেল করোনাভাইরাস এবং পরিবার নিয়ে মণ্ডলীর ভাবনা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ - ***বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি*** • ৭০

যুব তরঙ্গ

- বাংলাদেশে ওয়াইসিএস আন্দোলনের গোড়াপত্তনের স্মৃতি ও বর্তমান কিশোর কিশোরীদের নিয়ে ভাবনা - ***শিউলী রোজলিন পালমা*** • ৭৩
- ছেলেবেলা আমার নাট্যচর্চার চারণভূমি - ***জর্জ ডি'রোজারিও*** • ৭৬
- নতুন পুরাতনে সমন্বয় - ***মিতালী মারিয়া কস্তা*** • ৭৯

মহিলাঙ্গণ

- বন্ধুর পথে নারীর এগিয়ে চলা - ***অনিতা মার্গারেট রোজারিও*** • ৮০
- সাদা কালো জীবন (৪) - ***মালা রিবেরু (পামার)*** • ৮১

গল্প

- ক্ষমা - ***সাগর কোড়াইয়া*** • ৮৩
- নবজাতক - ***পি আর প্ল্যাসিড*** • ৮৪
- নাড়ীর বন্ধন - ***জোনাস এ বটলেরু*** • ৮৭
- ডায়রীর পাতা থেকে - ***এ এম আন্তোনী চিরান*** • ৯০
- লকডাউন - ***প্রদীপ মার্সেল রোজারিও*** • ৯২
- কৃপণ নিমাই মাস্টার - ***সিস্টার সীম্মি পালমা আরএনডিএম*** • ৯৪
- অসহায় মা - ***সিস্টার মিলন স্কলাষ্টিকা ক্রুশ এলএইচসি*** • ৯৫
- বিয়ের পাত্র - ***জ্যাকব ডি'রোজারিও*** • ৯৭
- মৃত সঞ্জীবনী সুধা - ***ডেভিড স্বপন রোজারিও*** • ৯৯
- পঞ্চপাণ্ডব ও রাজুদা - ***জয় চার্লস রোজারিও*** • ১০১

স্মৃতিচারণ

- মানবসেবায় উৎসর্গীকৃত যে প্রাণ - ***ড. আলো ডি'রোজারিও*** • ১০৩
- বড্ড অসময়ে চলে গেলেন সবুজ - ***ফাদার কমল কোড়াইয়া*** • ১০৬
- আমার দেখা নিধন ডি'রোজারিও - ***নীলু রুরাম*** • ১০৮
- সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ভালবাসার মানুষ • ১১০

স্বাস্থ্যকথা

- বাত পরিচিতি - ***ডাঃ মার্ক টুটুল গমেজ*** • ১১১
- বড়দিন উদ্‌যাপন ও মানসিক স্বাস্থ্য - ***সিস্টার লিপি গ্লোরিয়া রোজারিও - জেমস্ শিমন দাস*** • ১১৩

ভ্রমণ কাহিনী

- প্রথমবার বিলাত ভ্রমণ - ***পিয়া সরকার*** • ১১৫

কলাম

- খ্রিস্টমণ্ডলীতে সাধু-সাধ্বী - ***ফাদার দিলীপ এস কস্তা*** • ১১৬
- বাঙালি জম্পারদের আমেরিকা আবিস্কার - ***হিউবার্ট অরুণ রোজারিও*** • ১১৮
- বড়দিন আনন্দোৎসব ও বিশ্রাম উদ্‌যাপন- ***ড. ফাদার লিটন এইচ গমেজ সিএসসি*** • ১১৯

ছোটদের আসর

- অঞ্জলী'র বড়দিন - ***দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ*** -১২১
- অল্পতেই অধিক আনন্দ - ***উচ্ছাস এ রোজারিও*** -১২২
- রক্তের ঋণ - ***খোকন কোড়ায়া*** - ১২৩

কবিতার পাতা • ১২৪

বিশ্বমণ্ডলীর সংবাদ • ১২৯

বাংলাদেশে খ্রিস্ট মণ্ডলীতে যারা উল্লেখযোগ্য সাধনা ব্রতে শিক্ষাক্ষেত্রে গোড়াপত্তন করে গেছেন এবং ঐতিহাসিক কাজে যারা নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে রেখে গেছেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা আজ তাদের প্রায় ভুলতে বসেছি।

আজ, তাদের আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি যারা আমার ব্যক্তি জীবনে সৌভাগ্যক্রমে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলেন এবং যাদের কাছে আমি চিরঋণী।

Bp. L. Graner CSC

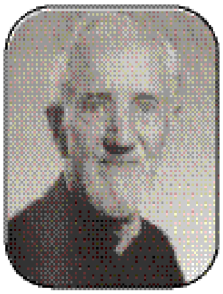

Fr. J. Jack Hennessy CSC

Bro. P. Hosinski CSC

Bro. walter J. Remfinger CSC

Bro. Andrew J. Steffes CSC

Bro.J. Bede Boderick CSC

Bro. James J. Tallarovic CSC

Bro. Hubert F. Pieper CSC

Bro. Tomas O'Keefe CSC

Bro. Fulgence J. Dougherty CSC

Bro. Ivan D. CSC

Bro. Dobald Schmitz CSC

Bro. Robert B. Hughes CSC

Arch Bp. Michael Rozario

Bp. Joachim Rozario, CSC

Bro. Brian J. Lyon CSC

Fr.T. Zimmerman CSC

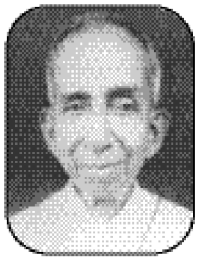

Fr. Dominic Rozario CSC

Fr. Peter CSC

Fr. Urban Corraya

Fr. Houser CSC

Fr. J. Stephen E. CSC

Fr. Evance CSC

Fr. Paul Gomes

Bp. Michael A. Rozario

সকল আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের প্রতি রইলো আমার এবং পরিবারের পক্ষ থেকে বড়দিনের এবং নববর্ষের শুভেচ্ছা।

শুভেচ্ছান্তে
ড. আগস্টিন ডি'ক্রুশ ও পরিবারবর্গ
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সেন্ট যোসেফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮০: বড়দিন সংখ্যা
ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
পৌষ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ

ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.wklypratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

করোনাভাইরাস-কোভিড ১৯ কালে বড়দিন উদ্‌যাপন

২৫ ডিসেম্বর যিশুর জন্মদিন। সারা বিশ্বে সর্বজনীনভাবে এ দিনটি মহানন্দে উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে। সারাবিশ্বের খ্রিস্টানগণ 'মেরী ক্রিসমাস' বলে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানায়। কিন্তু বাঙালিরা যিশুর জন্মদিনকে একান্ত আপন করে নিয়ে একে আখ্যায়িত করেছে 'বড়দিন' বলে। মহামতি যিশুর জন্মদিনই প্রকৃতপক্ষে বড়দিন। কেননা খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীগণ বিশ্বাস করেন যিশু হলেন ঈশ্বর তনয়, যিনি পবিত্র আত্মার শক্তিতে অলৌকিকভাবে মারীয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে মানব বেশে এ জগতে এসেছেন। ঈশ্বর মানুষ হয়ে মানুষকে মহিমান্বিত করে তুলেছেন। আর সঙ্গতকারণেই ঈশ্বরের মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করার ঘটনাটি মানব মুক্তির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘটনা ও সকলের বড়দিন। যিশুর জন্মদিন 'বড়দিনে' ঈশ্বর মানুষ হলেন মানুষকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করতে। যিশুর মধ্যদিয়েই স্বর্গীয় পিতা ঈশ্বর পূর্ণভাবে প্রকাশিত হলেন। সৃষ্টিকর্তাকে পূর্ণভাবে প্রকাশ এবং মানবজাতিকে সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করার জন্য যিশু খ্রিস্টের জন্ম হয়। পবিত্র বাইবেল ও মণ্ডলীর পরম্পরা শিক্ষা এ কথা বলে যে, যিশুর জন্মে স্বর্গীয় দূতবাহিনী, প্রান্তরের দীন-দুঃখী রাখাল ও গোশালার প্রাণীকূল আনন্দ প্রকাশ করেছিল। ত্রাণকর্তা যিশুর জন্মের মধ্যদিয়েই স্বর্গ ও মর্তের মধ্যে আনন্দময় সেতুবন্ধন রচিত হয়। তাই যিশুর জন্মদিন : বড়দিন মানবজাতির আনন্দের দিন।

বড়দিন ঈশ্বরের সর্বোত্তম অলৌকিক কর্ম : ঈশ্বর হলেন মানুষ, বাস করতে থাকলেন যুগ-যুগ ধরে মানুষের মাঝে। মানবকুলের সকল কৃষ্টি ও সকল যুগের মধ্যে তিনি প্রকাশিত হতে থাকেন ঈশ্বর-মানুষরূপে, ঈশ্বরপুত্র মানবপুত্র হয়ে। সঙ্গতকারণেই ঈশ্বরকে কাছে পেয়ে মানুষ আনন্দিত হয়। আর ঈশ্বরপুত্র যিশুর জন্মদিন বড়দিনে খ্রিস্টানগণ আনন্দ প্রকাশ করেন বাহ্যিকতার সাথে-সাথে আধ্যাত্মিকতায় প্রার্থনা ও উপাসনায়। করোনাভাইরাসের কারণে এবছর বড়দিন উদ্‌যাপনে বাহ্যিক আনন্দ আপাতত একটু কমই। আড়ম্বরতা হয়তো একটু কমে যাবে কিন্তু আন্তরিকতা বৃদ্ধি পাবে প্রত্যাশা করি। মহামারীর কারণে অনেকেই আর্থিক দৈন্যতার মধ্যে রয়েছে। বড়দিনের এই উৎসবে অনেকেই হয়তো আগের মতো জাঁকজমকভাবে উদ্‌যাপন করতে পারবেন না। আফসোস না করে গোশালার যিশুর দিকে তাকিয়ে অন্তরে প্রশান্তি আনুন। কেননা যিশুরাজা দীনবেশেই এসেছেন এ জগতে। দীনতা ও রিক্ততার মাঝেই আমরা তাঁকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি।

গতবছর বড়দিন আনন্দসহকারেই উদ্‌যাপিত হয়। এর পরপরই করোনাভাইরাসের ছোবলে বিশ্বে নেমে আসে হতাশা-নিরাশা, ভয়-শঙ্কা, নিরানন্দ-আশাহীনতা। ২০২০ খ্রিস্টাব্দের বড়দিন নিরানন্দে কাটবে জেনেও আমরা আনন্দিত হচ্ছি যে, বড়দিনের সময়কালেই বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা, প্রাপ্যতা ও প্রয়োগ নিশ্চিত হওয়া যাবে। বড়দিনের উপহার হিসেবে ধনী-গরীব সকল দেশের মানুষই এই ভ্যাকসিন পাবে এ আশা করা যাচ্ছে। এই করোনাকালে বড়দিনের প্রধান প্রার্থনা হচ্ছে, 'পৃথিবী করোনামুক্ত হোক'। বড়দিন আনন্দেও সব অনুষঙ্গ ত্যাগ করে পৃথিবী থেকে করোনা বিদায় নিক, তাহলে শান্তি পাবে মন। তবে আমরা এখনো নিশ্চিত হতে পারছি না কবে মানবজাতির কাছ থেকে এই করোনাভাইরাস বিদায় নেবে। পৃথিবী থেকে করোনার বিদায়ে মানুষ বড়দিনের আনন্দের চেয়েও বেশি আনন্দিত হবে। এবং এই আনন্দ পৃথিবীতে দ্রুত আসুক, এটিই এই করোনাকালে বড়দিনের প্রত্যাশা। তবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বড়দিনের সকল আচার-অনুষ্ঠান পালন করে নিজেদের মধ্যকার শুভত্বকে প্রকাশ করি। মনে রাখি, উৎসবের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি।

বড়দিনের মূল্যবোধ নম্রতা, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, সহযোগিতা ও সহভাগিতা চর্চা করে নতুন বছর শুরু করি মানবিকতায় বড় হবার প্রত্যাশায়। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সকল পাঠক, লেখক, সমালোচক, শুভাকাঙ্খী, উপকারি বন্ধু-বান্ধব ও সকলের প্রতি রইল বড়দিন ও নববর্ষের প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা॥ ✝

'ভয় করো না, কেননা দেখ, আমি তোমাদের এমন মহা আনন্দের শুভসংবাদ জানাচ্ছি, যে আনন্দ সমস্ত জনগণেরই হব : আজ দাউদ-নগরীতে তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন - তিনি খ্রিস্ট প্রভু।
- (লুক ২:১০-১১)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন ঃ www.wklypratibeshi.org

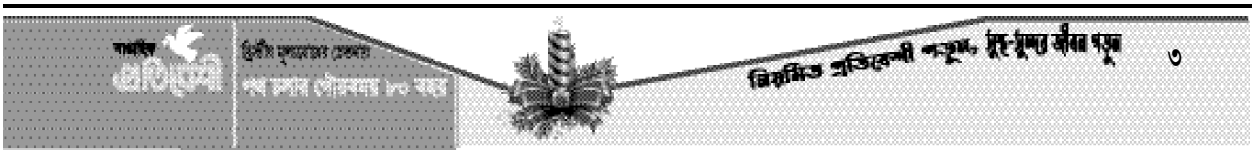

বড়দিনের শুভেচ্ছা

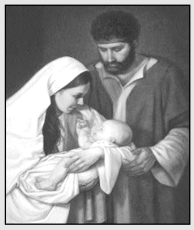

যিশু খ্রিস্টের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে সকলকে জানাই বড়দিনের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সকল বিশপ, পুরোহিত, ব্রাদার, সিস্টার, খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী, সকল সদস্য-সদস্যা, *'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র* সকল পাঠক, শুভাকাঙ্ক্ষী, লেখক-লেখিকা, উপকারী বন্ধু-বান্ধব ও বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি রইল কৃতাঞ্জলি। বাণীদীপ্তি, রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা বিভাগ, জ্যোতি কমিউনিকেশন, প্রতিবেশী প্রকাশনী, জেরী প্রিন্টিং প্রেস-এর সকল সম্মানিত ক্রেতা, গ্রাহক ও শ্রোতাদের প্রতি রইল আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। সকলের দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য এবং সফল আরেকটি বছর কামনা করছি। খ্রিস্টবর্ষ ২০২০ সকলের জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ ও আনন্দ।

ছুটির নোটিশ

শুভ বড়দিন উপলক্ষে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের সকল বিভাগ **২৪ ডিসেম্বর, ২০২০ থেকে ৩ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে**। প্রতিবেশীর পরবর্তী সাধারণ সংখ্যা প্রকাশ করা হবে আগামী ১৭ জানুয়ারি, রবিবার ২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

পরিচালক
খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র

রেডিও ও টিভি চ্যানেলে বড়দিনের অনুষ্ঠানমালা

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের সরাসরি প্রযোজনা ও সহযোগিতায় রেডিও ও টিভি চ্যানেলে বড়দিন উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এসব অনুষ্ঠানগুলো দেখা ও শোনার জন্য সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

বিটিভি'র অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠান : **মহিমময় বড়দিন**
রচনা : **সুনীল পেরেরা**
সম্প্রচারের সময় : **রাত ১০টার সংবাদের পর** (ব্যতিক্রম হলে প্রতিবেশী'র ফেইবুক পেইজে ও স্থানীয় পুরোহিতের মাধ্যমে পরিবর্তিত সম্প্রচার সময় জানিয়ে দেয়া হবে।)
সহযোগিতা : বাণীদীপ্তি
তারিখ : ২৫ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

সিলেট বেতার বাংলাদেশ

অনুষ্ঠান : **মুক্তির নববার্তা**
তারিখ : ২৫ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
সময় : বিকাল ৪:৩০ মিনিট
প্রযোজনা : বাণীদীপ্তি

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া (বাংলা বিভাগের) বড়দিনের বিশেষ অনুষ্ঠান দেখতে পারবেন অনলাইনে।
www.veritasbangla.org
www.facebook.com/veritasbangla1

অনুষ্ঠান : **ঐ মহামানব আসে**
গ্রন্থণা : **ডেভিড প্রণব দাস**
সম্প্রচারের সময় : **সন্ধ্যে ৭:৩০ মিনিট**
তারিখ : ২৫ ডিসেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

মহামান্য কার্ডিনালের বাণী

বড়দিন : ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুসম্পর্ক

সাম্প্রতিক সকল দুর্যোগকালেও, অনেক বিশ্বাস, প্রেম ও প্রত্যাশা নিয়ে আপনাদের সকলকে বড়দিনের ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব, সুখ ও শান্তি এবং ভালবাসা ও আনন্দময় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

করোনাভাইরাসের কারণে বিশ্ব বড়ো কঠিন সময় পার করছে। আমরাও সকলে সহযাত্রী ও সহভোগী। তথাপি বড়দিনের আগমন তো ভুলা যায় না। প্রভু যিশু আসেন অন্ধকারে আলো জ্বালাতে, আরও গভীরতা নিয়ে দৃশ্যমান হয়ে মানুষের অন্তরে বাস করতে, জগতের সকল দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক অসুস্থতা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে, বর্তমানের অসুস্থ জগত ও মানবসমাজকে নিরাময় সাধন করতে। আমাদের অন্তর উন্মুক্ত করে এসো আমরা গোশালা-রূপ দীন-গৃহে যিশুর আগমন ও তাঁর জন্ম সাদরে বরণ করি।

আমাদের পূণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বর্তমান পৃথিবীর সবকিছু লক্ষ্য ক'রে, বিশেষভাবে, করোনা মহামারীর ভয়াবহতা দেখে, তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, বর্তমান জগত কালো মেঘের অন্ধকারে আচ্ছাদিত। তিনি বলেন যে, মানুষের স্বাধীনতা, ন্যায্যতা ও গণতন্ত্র আজ বিকৃত; সামাজিক মিলনবোধ ও ইতিহাসবোধ অবলুপ্তির পথে; স্বার্থপরতা ও সর্বস্তরের মানুষের মঙ্গলের প্রতি মানুষের উদাসীনতা; মুনাফা লাভ ও অপচয়ের কৃষ্টি; বেকারত্ব, বর্ণবাদ ও দারিদ্র্য দ্বারা নানাভাবে মানুষ গ্রস্থ; নতুন দাসত্ব, মনুষ্য-পাচার, জোরপূর্বক ভ্রূণহত্যা, দেহাঙ্গ পাচার, প্রভৃতিতে মানুষের অধিকারের অবমাননা ও বৈষম্য ঘটছে অহরহ; মানুষ যেন সর্বত্র "প্রাচীর নির্মাণ" করছে; সবার বসতবাটি এই পৃথিবীটাকে যেন শেষ করে দিচ্ছে। পৃথিবী ও দীন-মানুষের কান্না ও আর্তনাদ সবার কানে পৌঁছছে না।

উপরোক্ত সবকিছু অন্তরে ধারণ করে, পোপ ফ্রান্সিস সকল মানুষের উদ্দেশে একটি পত্র লিখেছেন বিগত ৩ ফেব্রুয়ারি। ইতালি ভাষায় পত্রটির নাম "ফ্রাতেল্লী তুত্তি"; বাংলায় "ভাই-বোন সকল"। এই পত্রটিতে নতুন পৃথিবী গড়ার দর্শন বা রূপরেখা, অনেক যৌক্তিকতা ও আবেগ-সহকারে তিনি উপস্থাপন করেছেন। পত্রটির মূলভাব হচ্ছে: "ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধুত্ব"। বিশ্বে যদি সত্যিকারের ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে হয় তা হলে প্রত্যেক ব্যক্তির মানব মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

আমরা যারা খ্রিস্টবিশ্বাসী, আমাদের জন্য উক্ত দর্শন ও প্রেরণার প্রধান উৎস হচ্ছে খ্রিস্টযিশু যিনি মানবদেহ গ্রহণ করেছেন, ঈশ্বর হয়েও তিনি মানুষ হয়েছেন; সবাইকে তিনি নিজের ভাই-বোন বলে গ্রহণ করেছেন; তাদের মাঝে তিনি বাস করেন, সামাজিক সকল স্তরের মানুষের সাথে একাত্মতায় ও বন্ধুত্বে তিনি বাস করে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। যিশুই নবস্বপ্নের রূপরেখা। যিশু নিজেই "মঙ্গলবার্তা" বা "সুখবর" যা স্বর্গীয় দূতবাহিনী মানুষের কাজে জানাতে এসেছে আনন্দের সংবাদ হিসেবে। এটাই তো বড়দিন, বড়দিনের সঙ্গীত ও সংকীর্তণ যা অন্তরে সর্বদা প্রতিধ্বনিত হয়।

প্রিয়জনেরা, আমাদের আপন জীবন-সত্তায় বড়দিনের সঙ্গীত যদি থেমে যায়, তাহলে নিশেষ হয়ে যাবে আমাদের মমতাপ্রসূত আনন্দ, আস্থাপ্রসূত কোমল ভালবাসা, পুনর্মিলন প্রসূত সামর্থ যার উৎস হচ্ছে এই উপলব্ধি যে, ঈশ্বর নিজেই আমাদের ক্ষমা করেছেন ও আমাদেরকে প্রেরিত করেছেন। আমাদের বাড়িতে, জনসমাবেশে, কর্মক্ষেত্রে, আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক জীবনে বড়দিনের আনন্দ-সঙ্গীত যদি থেমে যায়, তা হলে সকল নারী-পুরুষের মর্যাদা রক্ষা করতে সব ধরণের কঠিন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হব। আমরা যারা খ্রিস্টান আমাদের জন্য যিশু, যিনি একমাত্র শুভসংবাদ তিনিই সকল মানবিক মর্যাদা ও ভ্রাতৃত্বের উৎস।

বড়দিন হচ্ছে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সম্পর্কের উৎসধারা, উৎসব-উদ্‌যাপন ও ভাবী প্রেরণা। বড়দিনে আমার কামনা, মানবদেহধারী খ্রিস্টযিশুকে জীবনে গ্রহণ করে আমরা প্রকৃত মানুষ হই, পরস্পরকে "ভাইবোন" বলে জ্ঞান করি এবং বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি না করে মিলন ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করি। বড়দিনের এই আশীর্বাদ প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজদলে বিরাজ করুক আগামী নববর্ষের প্রতিটি দিনে। শুভ বড়দিন।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি

আর্চবিশপের বাণী

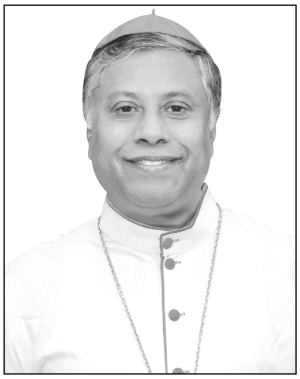

২০২০ খ্রিস্টবর্ষটি নানাভাবে আমাদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যতিক্রমধর্মী বছর। বছরের শুরু থেকেই বিশ্বব্যাপি করোনাভাইরাসের সংক্রমণে গোটা বিশ্বই ছিল আতঙ্কগ্রস্ত। প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে এবং ৬ কোটিরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। প্রতিদিন এর সংখ্যা বাড়ছে। আবার এ সময়ে যে ভূ-প্রকৃতি আমাদের বাঁচিয়ে রেখে সে যেন একটু শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পেরেছে এবং পরিশোধিত হয়েছে। পুণ্যপিতা এ বছরটিকে "লাউদাতো সি" বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এই বর্ষ পালনের উদ্দেশ্য হলো আমরা যেন আমাদের মাতৃস্বরূপ ধরিত্রী, সবার বসতবাটীকে আপন করে নেই ও বিশ্ব প্রকৃতির যত্ন করি। ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন সবই উত্তম হয়েছে *(আদি ১:৩১)*। মানুষের অতিমাত্রায় ভোগবাদী মনমানসিকতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, লোভ-লালসা এবং উদাসিনতার কারণে সৃষ্টি-প্রকৃতি বন-বৃক্ষনিধন, বাতাসে অতিমাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড, বায়ুদূষণ, পানি দূষণ ও দুর্গন্ধময়জল, জলাবদ্ধতা, খাল-ডোবা নিশ্চিহ্ন হওয়া, শব্দ দূষণ, কালোধোঁয়া, জীববৈচিত্র্য হ্রাস, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব গোটা মানবজাতি ও প্রকৃতিকে বিপর্যয় ও অকল্পনীয় বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই ক্ষত-বিক্ষত ধরিত্রীও যেন প্রতিশোধ নিতে উদ্যত। গোটা বিশ্বে ধনী-গরীবের ব্যবধান বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকৃতি ও মানুষের এই দূরাবস্থার জন্য মানুষই দায়ী। এর প্রতিকারের জন্য মানুষকে বিবেকী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মানুষকে গণমঙ্গলের কথা চিন্তা করতে হবে।

২৫ ডিসেম্বর আমরা পালন করছি মানব জাতির মুক্তিদাতা প্রভু যিশু খ্রিস্টের জন্মতিথি। তিনি এ জগতে এসেছিলেন মানব জাতিকে পাপ, অসত্য ও অন্যায় থেকে মুক্তি দিতে। তিনি ঐশরাজ্যের সুখবর ঘোষণা করেছেন। তিনি সুস্থতা দান করেছেন অগণিত রোগাক্রান্ত নর-নারীকে। ভালবাসা, সেবা, ন্যায্যতা, ঈশ্বরের বিশ্বাস ও প্রতিবেশী প্রেমের ওপর ভিত্তি করে তিনি নতুন মানবসমাজ গঠন করেছেন। যে সমাজে থাকবে মিলন, আনন্দ ও ভ্রাতৃত্ব। বর্তমানে আমরা যে সময়টিতে বসবাস করছি তখন চারদিকে দেখি হিংসা, রেষারেষি, স্বার্থপরতা, সন্ত্রাস, মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধ। সাথে যুক্ত হয়েছে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব, যিশু খ্রিস্টের আগমন বয়ে আনুক অনেক আশা, সুস্থতা, নতুন জীবন ও আনন্দ। বিশ্ব মুক্ত হোক এই নিষ্ঠুর ভাইরাসের হাত থেকে। সমস্ত অসত্য, অন্ধকার, ভয়, মিথ্যা, অত্যাচার দূরিভূত হোক। মানুষ লাভ করুক প্রকৃত সুখ ও শান্তি।

প্রভু যিশুর জন্মতিথি উপলক্ষে সবাইকে জানাই বড়দিনের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। প্রভু যিশুর আগমন আমাদের জীবনে বয়ে আনুক অনেক সুখ ও শান্তি।

The year 2020 was a very different time for all of us. From the very beginning the whole world has been experiencing the fatal effect of Covid -19. It spreads out everywhere in no time. More than 1,500,000 people died from it and more than 60,000,000 were infected, and still the situation has not come under control. But we saw that the earth and nature have been able to breathe and be purified. Pope Francis has announced a `Laudato Si' year. The intention is to love and take care of the earth and nature. After creating, God saw all he had made, and indeed it was very good *(Cf. Gen 1:31)*. Now we find that the earth and nature are being polluted and disfigured because of our greed, selfishness, profit and consumerist attitude and indifference to the nature.The consequence is de-forestation, increase of air pollution and noise pollution, too much Carbon dioxide in the air, polluted water, climate change, warming of the whole world and all these misuses have negative influence on the humanity and nature. The natural environment has been gravely damaged by our irresponsible behaviour.The earth cries out because of the harm, violence and damage we have inflicted on her. Now the earth and nature is about to take revenge. We need to take a conscientious decision to stop all these damages on earth, and to take care of the earth and nature.

In the midst of all these Christmas is at hand. Jesus came to the earth as Saviour of the world. He preached the good news of the Kingdom of God. He cured all kinds of diseases, brought life and joy to people. Now we are enslaved by sin, discrimination, injustice, envy, selfishness etc. At the same time, the earth is sick and humanity is also facing different deadly sickness very especially Covid -19. Fear, insecurity and suspicion are becoming dominant. Let the coming of Jesus at Christmas renew the whole world with a new vision and hope. May he bring us recovery from this Coronavirus. Let the world be filled with a sense of freedom, fraternity, joy and peace.

Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year.

Most Rev. Bejoy N D'Cruze OMI
Archbishop of Dhaka

বাণী

সারা বিশ্বে মহানন্দে বড়দিন উদ্‌যাপন হয় ২৫ ডিসেম্বর। সারা বিশ্বের খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ যথাযথভাবে বাহ্যিক ও আত্মিক প্রস্তুতি নিয়ে এই দিনটি পালন করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। কেননা এদিনটিতে স্মরণ করা হয় ঈশ্বরপুত্র যিশুর জন্মদিন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বেথলেহেমের এক জীর্ণ গোশালায় চরম দারিদ্র্যে যিশুর জন্ম হয়। যিশুর জন্মে তাঁর জন্মস্থানটি উজ্জ্বল আলোতে ভরে উঠে এবং সে আলো দেখে মাঠের রাখালেরা ছুটে আসে ত্বরা করে। যাবপাত্রে অনিন্দ্যসুন্দর শিশুকে দেখে তাদের মন আনন্দে ভরে ওঠে। সেই একই আনন্দ নিয়ে প্রতিবছর বড়দিন আসে আমাদের জীবনে। এই আনন্দ ভালবাসার, ক্ষমার, সহভাগিতা-সহমর্মিতা, মিলনের ও একতার। করোনাভাইরাস মহামারী সংকটে বড়দিন উদ্‌যাপনের বাহ্যিক ঘনঘটা না থাকলেও মনের আনন্দ একই থাকবে। কেননা মহামারীর এই সংকট আমাদেরকে সহভাগিতা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করার সুযোগ এনে দিয়ে মন-অন্তরের কাছাকাছি হবার আহ্বান জানাচ্ছে। যেমনটি যিশু নিজেই করেছেন। তিনি ঈশ্বর হয়ে সসীম মানুষের সাথে এক হলেন মানব দেহধারণের মধ্যদিয়ে।

যিশু মানব দেহধারণের মাধ্যমে মানুষের সাথে এক হলেন এবং মানুষের মধ্যে বসবাস করতে লাগলেন। মানবসত্তার ও ঐশসত্তার মিলন হলো। ঈশ্বর মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রকাশ করলেন এবং মানুষের সাথে যোগাযোগ গড়ে তুললেন। তিনি নিজেকে রিক্ত করলেন ও বিলিয়ে দিলেন। মানুষকে ভালবাসার কারণেই তা করলেন। যিশু ঈশ্বর হয়েও পরিপূর্ণ মানুষ হলেন যাতে করে মানুষও ঈশ্বরত্বের পানে ধাবিত হতে পারে। তাই প্রতিবছরের বড়দিনই আমাদেরকে সুযোগ দান করে নিজের মধ্যে ঈশ্বরত্বের উপস্থিতিকে নবীকৃত করতে। অন্যের মঙ্গলের জন্য নিজেকে দান ও রিক্ত করতে পারা ঈশ্বরের এক মহাশীর্বাদ।

২০২০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব দারুণভাবে অভিজ্ঞতা করছে ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মানুষের অসহায় করুণ অবস্থা। ছোট্ট একটি ভাইরাসের কাছে মানুষ নেতিয়ে পড়েছে। অনেক মানুষের জীবন ও জীবিকা হানির কারণ হলেও করোনাভাইরাস মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়ে বলছে, নিজেদের রক্ষা করতে চাইলে ভোগ-বিলাসিতা বাদ দিয়ে প্রকৃতির যত্ন নাও আর রেষারেষি, হিংসা-অহংকার ভুলে একজন আরেকজনের পাশে দাঁড়াও। যেকথাগুলো পোপ ফ্রান্সিস অনেকদিন ধরেই বিশ্বকে বলে আসছেন। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে 'লাউদাতো সি' সর্বজনীন পত্রটির মধ্যদিয়ে তিনি বিশ্ববাসীকে প্রকৃতির কান্না শুনে যত্ন নেবার উদাত্ত আহ্বান রাখেন। প্রকৃতির যত্নদান অব্যাহত রাখতে এবছর মে মাসে এই পত্রের পঞ্চবার্ষিকী উদযাপনের সময় তিনি আগামী একটি বছরকে প্রকৃতি-পরিবেশ বর্ষ হিসেবে উদ্‌যাপনের অনুরোধ করেন। একই পত্রে পোপ মহোদয় শরণার্থী-অভিবাসী, দীন-দুঃখী ও প্রান্তিকজনদের প্রতি সংবেদনশীলতা প্রকাশ করতে বলেন। 'ফ্রাতেল্লি তুত্তি বা সকল ভাইবোন' সর্বজনীন পত্রটির মধ্যদিয়ে পোপ ফ্রান্সিস আমাদেরকে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন ও সামাজিক বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করছেন। বড়দিন সত্যিই বড় হয়ে উঠবে যখন আমরা সকল মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবো এবং পরস্পরকে ভাইবোন বলে গ্রহণ করতে পারবো।

মানুষের প্রতি ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে প্রভু যিশু মানুষরূপে জন্ম নিয়ে এই জগতের মাঝে এলেন এবং মানুষের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে একাত্ম হলেন। তিনি তাঁর আগমনের মাধ্যমে জগতের কাছে পিতা ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশ করলেন যেন জগতের মধ্যে হিংসা, সন্ত্রাস, নির্যাতন বন্ধ হয়ে ভালবাসা ও মিলনের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতিবেশীর সকল পাঠকদের জানাই শুভ বড়দিনের ও নববর্ষের শুভেচ্ছা। প্রভু যিশুর জন্মদিন শুভ বড়দিন আপনাদের জন্য আনন্দময় হোক এবং নববর্ষ সবার জীবনে বয়ে আনুক সফলতা ।

বিনীত খ্রিস্টেতে,

+বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী

খুলনা ধর্মপ্রদেশ।

সভাপতি, বিশপীয় সামাজিক যোগাযোগ কমিশন (সিবিসিবি)

বড়দিন : বিশ্বভ্রাতৃত্বের উৎসব

বিশপ জের্ভাস রোজারিও

ভূমিকা

"বড়দিন" এখন একটি বিশ্বজনীন বা সর্বজনীন আনন্দ-মিলন ও ভ্রাতৃত্বের উৎসব। বড়দিন হলো যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন, খ্রিস্টানদের একটি আনন্দ-মহোৎসব, কিন্তু বর্তমানে বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টান ও অখ্রিস্টান প্রায় সকলেই এই উৎসবে শরিক হয়। বাড়ি-ঘর সাজগোজ করে, রকমারী খাদ্য-খাবারের আয়োজন করে, নতুন পোশাক-আশাক তৈরি করে, দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সাজিয়ে আলোকসজ্জা করে, কার্ড ও শুভেচ্ছা বিনিময় করে, উপহার আদান-প্রদান করে, এবং পারিবারিকভাবে একত্রে মিলিত হয়ে নানাভাবে ও নানারূপে এই উৎসবটি পালিত হয়ে থাকে। খ্রিস্টানরা গির্জায় প্রার্থনা করে ও উপাসনায় অংশ নেয়; কিন্তু অন্যদের জন্য এটা শুধুই আনন্দোৎসব। খ্রিস্টানদের মধ্যেও আজকাল অনেকেই গির্জা প্রার্থনার চাইতে বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ সামাজিক বা পারিবারিক উৎসব পালন করতেই বেশি আগ্রহী। তাই তো অনেক সময়ই মনে হয় বড়দিন বুঝি শুধুই একটি সামাজিক উৎসব বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

কিন্তু আসলে তো তা নয়। বড়দিন হলো যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন। এই পৃথিবীর মানুষ যখন পাপের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, পাপের কঠিন শাস্তি থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার আর কোন উপায় তাদের ছিল না, তখন ঈশ্বর নিজেই জগতের সকল মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করতে তাঁর একমাত্র পুত্র যিশু খ্রিস্টকে এই পৃথিবীতে পাঠান। ঈশ্বর জগত সৃষ্টির পর থেকেই যুগে-যুগে মানুষকে পবিত্রতার ও আলোর পথ দেখাতে পিতৃকুলকে, রাজাদের, প্রবক্তাদের, পরিচালকদের পাঠিয়েছেন। কিন্তু কালের পূর্ণতায় তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র যিশুকেই জগতের পাপ পঙ্কিলতা ও অন্ধকার থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে পাঠালেন। বড়দিন এই জন্যই ঈশ্বরের প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতা জানানো ও অনন্দ প্রকাশের উৎসব।

বড়দিন একটি আলো ও শান্তির উৎসব

বাইবেলের ভাষায়, "যে জাতি চলছিল অন্ধকারে তারা আজ দেখতে পেয়েছে এক মহাজ্যোতি"। যিশু নিজেই সেই মহাজ্যোতি যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকেই নেমে এসেছেন, আর যিনি পৃথিবীর সকল জাতির সকল দেশের ও সকল কালের মানুষকে আলোর পথ দেখাবেন। তিনি এই পৃথিবীর পাপপঙ্কিলতা দূর করে তিনি এই পৃথিবী ভরিয়ে দিবেন আলোর ঝলকানিতে। কিন্তু বর্তমানে এই পৃথিবী যেন ভরে আছে নিকষ অন্ধকারে। আমাদের পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস সম্প্রতি "ফ্রাতেল্লি তুত্তি" নামক একটি সর্বজনীন পত্র প্রকাশ করেছেন যার মধ্যে তিনি কালো মেঘের সেই অন্ধকারের কথাই বলেছেন। সেই অন্ধকারের কারণ হলো মানুষের স্বার্থপরতা আর লোভ যার ফলে এই পৃথিবীর সকল সম্পদ কুক্ষিগত করছে এক শ্রেণির কিছু মানুষ, আর দরিদ্ররা হারাচ্ছে তাদের যা আছে তা-ও। দিনে-দিনে দরিদ্রদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে; তাদের সঙ্গে যোগ হচ্ছে অভিবাসী ও পাচারকৃত সকল মানুষ, প্রবীণ ব্যক্তি, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ, সমাজের প্রান্তসীমায় পড়ে আছে যে সকল নিগৃহিত মানুষ, আরও অনেকে। এইসব মানুষের জীবনেকে আশার আলো জ্বালবে? অসহায় ও দরিদ্রদের অনেক সমস্যা রয়েছে আর তারা পদে-পদেই বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বর তো সকল মানুষকেই সমান মানব মর্যাদা আর সমান সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সেই অবস্থা এখন আর নেই; তা নষ্ট হয়েছে বা ধ্বংস হয়েছে লোভী আর স্বার্থপর মানুষের কারণে। দরিদ্র ও সমাজের প্রান্তসীমায় পড়ে থাকা মানুষের জীবন আনন্দ আলোতে ভরে দিতে হলে তাদের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। দরিদ্র হোক বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর হোক, কাউকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে সমাজের, দেশের বা বিশ্বের কোন টেকসই বা সমন্বিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। এখন আমাদের বিশ্বের সকলেরই দায়িত্ব হলো উত্তর-দক্ষিণ বা পূর্ব-পশ্চিমের সকল প্রকার বৈষম্য দূর করা। অন্যদের কাছে তা দাবী করার আগে আমাদের দেশে ও সমাজে তা শুরু করতে হবে। আর তা আমাদের হৃদয় থেকেই এই অভিযান শুরু করতে হবে। তাহলেই বড়দিন অর্থাৎ যিশুর জন্মদিন হবে অর্থবহ ও বিশ্বজনীন ভালবাসা ও মিলনের উৎসব।

যিশু খ্রিস্টের জন্মের সময় স্বর্গদূতেরা গেয়ে উঠেছিল, "উর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের মহিমা, আর পৃথিবীতে তাঁর অনুগৃহিত মানুষের অন্তরে শান্তি"। যিশু এই পৃথিবীতে সকল মানুষের অন্তরে শান্তি দিতে এসেছিলেন; আর তা ন্যায্যতা স্থাপন করা ছাড়া সম্ভব নয়। মানুষে-মানুষে বৈষম্য ও ভেদাভেদ সেই ন্যায্যতার পরিপন্থী। মঙ্গলসমাচারে যিশুর যে ভালবাসা বিধৃত হয়েছে তার ফল ন্যায্যতা; আর ন্যায্যতা সমাজে ও বিশ্বে শান্তি আনয়ন করে।

ভালবাসা মানুষের হৃদয়কে অন্য মানুষের প্রতি বা বিশ্বসৃষ্টির প্রতি উন্মুক্ত করে। হৃদয়ের সেই উন্মুক্ততা পরিবার থেকেই শুরু হয়। পরিবারের স্বামী-স্ত্রী ও তাদের সন্তানদের মধ্যে উন্মুক্ত হৃদয়ের ভালবাসার আদান-প্রদান পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আনন্দের মিলন ঘটায়। যিশু বড়দিনের সময় আমাদের সকলকে সেই মিলনের আনন্দ দিতেই এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। গরীব মানুষের অভাব মোচন হলে তার মনে শান্তি আসে, ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষুধা নিবারণ হলে তার মনে শান্তি আসে, অভিবাসী মানুষের অনিশ্চয়তা দূর হলে তার মনে শান্তি আসে, আশ্রয়হীন মানুষের আশ্রয় হলে তার মনে শান্তি আসে, এভাবে মানুষের মনে শান্তিলাভের এরূপ আরও অনেক উপায় বা পথ আছে। কিন্তু সেই উপায় কে করে দিবে, যদি আমরা তা না করি পরস্পরের জন্য?

বড়দিন দুস্থ ও দরিদ্রদের আর্তনাদ নিরাময়ের সময়

পাপে নিমজ্জিত অন্ধকারের মানুষের জন্য, স্বর্গবঞ্চিত পথভ্রান্ত মানুষের জন্য যিশুখ্রিস্ট এই কাজটি করেছেন। তিনি এই জগতের সব মানুষকে পরিত্রাণের আলো দিতে, আর স্বর্গের অধিকার দিতে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। আর তা তিনি করেছেন সর্বোচ্চ ত্যাগস্বীকার করে, নিজের জীবন উৎসর্গ করে। সেই জন্যই তো যিশুর খ্রিস্টের জন্মদিন মহাআনন্দের আর উৎসবের। আমরা যারা যিশুর উপর বিশ্বাস নিয়েছি, আমাদেরও এই ত্যাগ ও সেবার পথ অনুসরণ করতে হবে। পোপ ফ্রান্সিস তাঁর পত্র "ফ্রাতেল্লী তুত্তি"-তে মঙ্গলসমাচারের দয়ালু সামারীয়ের উপমা কাহিনীর মধ্যদিয়ে দেখিয়েছেন কিভাবে আমরা তা করতে পারি। ডাকাতের হাতে পড়া আহত ও অসহায় লোকটিকে সেবা করা তো মন্দিরের পুরোহিত ও সেবকের কর্তব্য ছিল; কিন্তু তারা তা করেনি। তারা দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে। কিন্তু সামারীয় লোকটি সেই আহত দুস্থ লোকটির সেবা করেছে; তার মানবীয় দায়িত্ব পালন করেছে। আমরা কি মন্দিরের পুরোহিত আর সেবকের মত মানবীয় সেবা ও দয়ার কাজের দায়িত্ব এড়িয়ে যাই নাকি তা পালন করি? এই পৃথিবীর বর্তমান মনোভাব কিন্তু এই দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার মনোভাব। বর্তমানে দরিদ্রদের আর্তনাদ কেউ শুনতে চায় না; কেউ দুস্থ অসহায়দের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় না। যারা সমাজ ও পরিবারের প্রান্তসীমায় পড়ে আছে তাদের কেউ খোঁজ করে না। যারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে বৈষম্য নিগ্রহের শিকার তাদের তুলে ধরতে কেউ এগিয়ে আসতে চায় না। যারা অধিকার বঞ্চিত তাদের অধিকারের মর্যাদা কেউ দিতে চায় না। এমনকি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যারা নেতৃত্বের আসনে আসীন তারাও নিজেদের প্রকৃত দায়িত্ব- সকল মানুষের ও গোটা মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণ করা - থেকে চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে রখেন। পোপ ফ্রান্সিস সেই মনোভাবের পরিবর্তন কামনা করেছেন তাঁর এই সর্বজনীন পত্রে। যারা দুস্থ ও অসহায় হয়ে কান্না করছে, আমাদের দিকে তাকিয়ে আর্তনাদ করছে তারা আমাদের ভাই-বোন, আমাদের প্রতিবেশি। তাদের মুখে হাসি ফুটানো সকলের দায়িত্ব। আমরা তো তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারি না। তাহলে বড়দিন হয়ে যাবে স্বার্থপরবিলাসী উৎসব, যা অন্তরের স্থায়ী আনন্দ ও শান্তি আনতে পারে না।

বড়দিন দায়িত্ব নিবার দিন

ঈশ্বর পাপে নিমজ্জিত মানব জাতিকে উদ্ধার করতে বা পরিত্রাণ দিতে নিজেই দায়িত্ব নিয়ে যিশুকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। মানুষ কখনই নিজেকে পাপের এই শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারতো না, যদি ঈশ্বর তাকে মুক্ত না করতেন। বড়দিনের তাৎপর্য হলো যে ঈশ্বর তাঁর পুত্র যিশুকে দায়িত্ব দিয়েছেন যেন তিনি জগতের সকল মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করে স্বর্গে নিয়ে যান। যিশু জগতের মানুষকে ভালবেসে নিজের জীবন ক্রুশের উপর বিসর্জন দিয়ে তাঁর সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই বড়দিন হলো ভালবাসা নিয়ে নিস্বার্থভাবে অন্য মানুষের দায়িত্ব নেওয়া। বিশেষভাবে যাদের দয়া ও ভালবাসার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। তাদের মধ্যে আছে অভাবগ্রস্ত দুস্থ অসহায় মানুষ, পরিবারের প্রবীণগণ, প্রতিবন্ধীরা, শিশুরা, ইত্যাদি। যিশু আমাদের শিখিয়েছেন যেন আমরা পরস্পরের বা অন্য মানুষের দায়িত্ব নেই, তাদের যত্ন করি। ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পরিবারে ও সমাজে; সে একা নয়, একা সে বাঁচতে পারে না। মানুষ হিসাবে আমরা সর্বদা সকলে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা শুরু হয় পরিবারে আর তার ভিত্তি হলো ভালবাসা। ভালবাসার কারণে পরিবারের স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা-সন্তান সন্ততি, এবং পরিবারের অন্য সদস্যরা পরস্পরের দায়িত্ব নেয়। প্রেম ভালবাসা পরিবারেই শুরু হয় আর মানবসভ্যতা পরিবারের পথ ধরেই এগিয়ে চলে। শুধু পরিবারের সদস্যদেরই নয়, সকল মানুষই আমাদের মানব পরিবারের সদস্য। সকল মানুষের দায়িত্বই আমাদের; তাদের সকলকেই আমাদের যত্ন করতে হবে। শুধু মানুষের যত্নই নয়, আমাদের যত্ন করতে হবে ঈশ্বরের সৃষ্ট সব কিছুরই। পোপ ফ্রান্সিস "লাউদাতো সি'" নামক সর্বজনীন পত্রে আমাদের সেই আহ্বান জানিয়েছেন। আমাদের যত্ন করতে হবে সকল সৃষ্টিকে আর আমাদের প্রকৃতিকেও। ঈশ্বর যে পৃথিবী নামক ধরিত্রী তৈরী করে আমাদের সকল মানুষের অভিন্ন বসতবাটী হিসাবে দিয়েছেন তা তো মানব জাতির প্রতি তাঁর ভালবাসারই প্রমান। এই যে তাঁর ভালবাসা তা কি আমরা নষ্ট করে ফেলবো? বড়দিন ঈশ্বরের সেই অমূল্য ভালবাসার মূল্যায়ন করার সময়; তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময়।

বড়দিন জীবনের উৎসব

যিশু তাঁর জন্মের পরেই হেরোদের সহিংসতার মুখোমুখি হয়েছিলেন। যদিও ঈশ্বরের নির্দেশ পেয়ে তাঁর পিতা-মাতা অর্থাৎ যোসেফ ও মারীয়ার সঙ্গে মিশর দেশে পালিয়ে গিয়ে প্রাণে বেঁচেছিলেন, বেথলেহেমের নিষ্পাপ নবজাতক শিশুরা হেরোদের নৃশংসতার শিকার হয়ে জীবন দিয়েছিল। সেই অবস্থা বর্তমানেও রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ, সহিংস গোষ্ঠি-দ্বন্দ্ব, ধর্মীয় সহিংসতা, ইত্যাদির কারণে বহু মানুষকে জীবন দিতে হচ্ছে। যারা জীবন দিচ্ছে তাদের নিজেদের কোন দোষ নেই, অথচ তারাই রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়কদের স্বার্থের জন্য জীবন বিসর্জন দিচ্ছে। বহু মানুষকে এই কারণে বস্তুচ্যুত বা দেশান্তরী হয়ে অন্য স্থানে বা দেশে শরণার্থী হতে হচ্ছে। পোপ ফ্রান্সিস স্পষ্ট করেই বলেছেন যে কোন মতভেদ বা দ্বন্দ্বের সমাধান যুদ্ধ দিয়ে সম্ভব নয়, অর্থাৎ যুদ্ধ কোন সমস্যার সমাধান দিতে পারে না বা শান্তি আনতে পারে না। সেখানে সংলাপের পথ অবলম্বন করতে হবে। শুধু যুদ্ধই নয়, পরিবারে ও সমাজে এখন সহিংসতা ও নির্যাতন একটি বড় ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারী ও শিশুরা অহরহই নির্যাতিত হচ্ছে। এই সহিংসতা ও নির্যাতন মানুষের সেই কলুষিত ও পাপময় স্বভাবই প্রকাশ করে যা হেরোদের ছিল। সমাজে আরও একটি ভয়ঙ্কর জীবন-বিরুদ্ধ পাপ রয়েছে, আর তা হলো মাতৃগর্ভের ভ্রূণ হত্যা করা বা গর্ভনাশ করা বা গর্ভপাত ঘটানো। যে মাতৃগর্ভে মানব শিশু নিরাপদ ও ভালবাসার আশ্রয় খোঁজে সেই মাতৃগর্ভই হয়ে ওঠে তাঁর মরণ ফাঁদ; মৃত্যুদূত সেখানেই হানা দেয় তাঁকে হত্যা করতে। সেই বেথলেহেমের শিশুদের মত তাদের জীবন দিতে হয় বিনা দোষে। বড়দিন হলো জীবনের উৎসব, জীবনদানের উৎসব। বড়দিনের সময় আমাদের প্রত্যাশা হলো যেন সমাজ ও পরিবার থেকে, এই বিশ্ব থেকে

যেন জীবন-বিরুদ্ধ সকল কর্মকাণ্ড দূর হয়, যেন দূর হয় সকল প্রকার নির্যাতন ও সহিংসতা। বিশ্বময় গড়ে উঠুক ভালবাসার সভ্যতা বা সংস্কৃতি।

বড়দিন উন্মুক্ততা ও সাম্যের উৎসব

যিশু খ্রিস্টের জন্মের সময় স্বর্গদূতেরা এসেছিল শান্তির গান গেয়ে ও আনন্দ সংবাদ নিয়ে। শিশু যিশুকে অবাক বিস্ময়ে দেখতে এসেছিল মাঠের রাখালরা। বিশ্বরাজ খ্রিস্টকে পূজা করতে আর উপঢৌকন দিতে এসেছিলেন পূর্বদেশীয় পণ্ডিতগণও। যিশু খ্রিস্টের জন্ম তাই ছোট-বড় ও ধনী-গরীবের মিলনের উৎসব; সকলের সঙ্গে উপহার বিনিময়ের, ভালবাসা বিনিময়ের উৎসব। যিশু এসেছিলেন এই পৃথিবীতে যেন ভেদাভেদ ও বৈষম্য না থাকে- সকল মানুষ যেন সমান মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা পায়। ধনী ও গরীব বা ছোট ও বড় সকলেই যেন যিশুর কাছে আসতে পারে। তবে এই জগতের গড়া ব্যবস্থার মধ্যে ধনী ও গরীব এবং ছোট ও বড় মানুষের বৈষম্য বা ভেদাভেদ রয়েছে- অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। পোপ ফ্রান্সিস তাঁর "ফ্রাতেল্লী তুত্তি" পত্রে বলেছেন যেন এই জগতের মানুষ আমরা এই সঙ্কীর্ণতাকে জয় করি আমাদের হৃদয়ের উন্মুক্ততার মাধ্যমে। তিনি সকলের প্রতি একটি উন্মুক্ত পৃথিবী গড়ার আহ্বান জায়িছেন। আর তা আমরা করতে পারি আমাদের আশে-পাশে যে দরিদ্র মানুষেরা রয়েছে বা সমাজের প্রান্তসীমায় যে দুস্থ অসহায় মানুষেরা পড়ে আছে তাদের প্রতি ভালবাসা ও দয়া দেখিয়ে। এই জন্য আমাদের থাকতে হবে একটি উন্মুক্ত হৃদয়। আমাদের সকলের উন্মুক্ত হৃদয় একটি উন্মুক্ত বিশ্ব গড়ে তুলতে পারবে। সেই বিশ্বে সকলেই থাকবে সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে। এই ক্ষেত্রে যারা রাজনীতি করেন বা দেশ পরিচালনায় নেতৃত্ব দেন, তাদের উচিত ব্যক্তি মানুষের মর্যাদা ও অধিকারকে সবার উপরে স্থান দেওয়া। শুধু নিজের দেশের মানুষকেই নয়, সকল মানুষ- দেশী-বিদেশী সকলকেই- যেন তারা উপযুক্ত মানবীয় মর্যাদা দান করে। রাজনীতির আসল লক্ষ্য হলো শৃঙ্খলা ও শান্তিপূর্ণ "জনকল্যাণ" বা সকলের মঙ্গল সাধন করা। দরিদ্র, অভিবাসী, যুদ্ধ বা সহিংসতার কারণে বিতারিত আশ্রয়প্রার্থী জনগোষ্ঠী, সকলের মঙ্গল সাধন করা তাদের উচিত। তাছাড়া রাজনৈতিক উদ্দেশে বা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে কোন যুদ্ধকেই "ন্যায় যুদ্ধ" বা সহিংস সংগ্রাম করা সঠিক নয়। পোপ ফ্রান্সিস "অহিংস" নীতিই সমর্থন করেছেন তাঁর "ফ্রাতেল্লী তুত্তি"তে। তিনি আহ্বান জনিয়েছেন পৃথিবীকে সকল দেশের সকল মানুষের জন্য এক সাম্য ও মৈত্রির পৃথিবী হিসাবে গড়তে। যিশুর জন্ম সেই আহ্বানই জানায়।

সমাজের ও বিশ্বের দেশে-দেশে যে সীমারেখা বা সীমান্ত রচিত হয়েছে তা ঈশ্বরের সৃষ্ট নয়, মানুষের সৃষ্টি। তাই পৃথিবীর সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে সকল দেশের সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার। যারা বিভিন্ন কারণে অভিবাসী হয়ে দেশের অভ্যন্তরে বা অন্য দেশে স্থানান্তরিত হয়, তাদের আশ্রয় ও সহায়তা পাওয়ার অধিকার আছে। তবে এই ক্ষেত্রে অবশ্যই দেশের সার্বভৌমত্ব বা এলাকার অখণ্ডতা, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার কথাও ভাবতে হবে আর গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু মানুষের অন্তর্নিহিত মর্যাদা ও অধিকার যেন তাতে ক্ষুন্ন না হয় সেই লক্ষ্যও রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে ব্যক্তিগত বা প্রাইভেট সম্পদ ব্যক্তির অধিকার ও মর্যাদার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটা শুধু আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিমণ্ডলেই নয়, আমাদের পরিবারে ও সমাজেও এই হৃদয়ের উন্মুক্ততা ও মিলনের মূল্যবোধ চর্চিত হতে হবে। আমরা যেন কেউ কাউকে পিছনে ফেলে না রাখি বা আমাদের পরিমণ্ডলের বাইরে ফেলে না রাখি। বড়দিনে আমাদের সেই ভাবনা ভাবতে হবে- একই যিশু আমাদের সকলের জন্য একই পরিত্রাণের ফল নিয়ে এসেছেন। আমরা বড়দিনে আমাদের আনন্দ বাড়িয়ে তুলতে পারি পরিবারে ও সমাজে যদি সকলে উন্মুক্ত হৃদয় হতে পারি- আমাদের সকল ভাই-বোনকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠতে পারি।

মিলন ও ভ্রাতৃত্ব গড়ার বড়দিন

ঈশ্বরের ওপর আমাদের বিশ্বাস আমাদের হৃদয়কে প্রসারিত করে ও উদার করে। নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আমরা অন্যদের কাছে বা তাদের হৃদয়ে পৌঁছতে পারি। কোন ধর্মই মানুষকে সঙ্কীর্ণ হতে শিখায় না, খ্রিস্টধর্ম তো নয়ই। সেইজন্য ধর্মবিশ্বাসগুলোকে হতে হবে সকল দেশের ও সংস্কৃতির সকল মানুষের মধ্যে একটি টেকসই মিলন ও ভ্রাতৃসমাজ গড়ে তোলার উপায় বা মাধ্যম। ধর্মের অপব্যাখ্যা করে যারা জনগণকে বিভ্রান্ত করে, তারা আর যা-ই হোক তাদের ধর্মবিশ্বাসের সেবা করে না, বা তা করতে পারে না। তারা নিজের স্বার্থই চরিতার্থ করে ও মানুষের সাথে প্রতারণা করে। পোপ ফান্সিস ২০১৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি আবুধাবী সফরের সময় আল্ আজ্হার মসজিদের (কায়রো, মিশর) গ্র্যান্ড ইমাম আহ্মদ আল তাইব-এর সাথে সম্পাদিত দলিল "বিশ্বশান্তি ও সহাবস্থানের জন্য মানব-ভ্রাতুত্ব" থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে "ফ্রাতেল্লী তুত্তি" তে বলেছেন যে, সহিংসতার পথ কোন কিছুই সমাধান করতে পারে না; বরং ধৈর্য ও সংলাপের পথই উৎকৃষ্ট পথ যার দ্বারা কঠিন সমস্যাও সমাধান করা যায়। বড়দিন আমাদের সেই পথই দেখায় কারণ বড়দিন হলো ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সংলাপের দিন। জাগতিকভাবে এই সংলাপ শুরু হয় ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে। আমরা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অনেকবার ধৈর্যহীন হয়ে সহিংসতার পথ ও উপায় অবলম্বন করে থাকি। পরিবারে ও সমাজে আমাদের অনেক বৈষম্য, অন্যায্যতা, শোষণ, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, ইত্যাদি আমাদের জীবনকে দুর্বিষহ ও অস্থির করে তোলে। আমরাই আমাদের জীবনকে বিষিয়ে তুলি বিভিন্ন স্বার্থদ্বন্দ্বে ও সহিংস আচরণে। অথচ যিশুর জন্মদিন বড়দিন আমাদের উল্টো শিক্ষাই দেয়।

উপসংহার

বড়দিন হলো আনন্দ ও মিলনের উৎসব; কিন্তু সেই আনন্দ ও মিলন সম্ভব হবে না যদি সেখানে থাকে পাপ-পঙ্কিলতার মহোৎসব। সমাজে বা পরিবারে, দেশে বা বিশ্বে ঈশ্বর তনয় যিশু জন্মেছিলেন বিশ্বের সকল মানুষকে পাপ থেকে পরিত্রাণ দিতে, ভালবাসার বাতাবরণে ন্যায্যতা ও শান্তি দিতে এবং সকলকে এক করে সাম্য ও মিলনসমাজ গড়তে। আমরা সেই যিশুর জন্মোৎসবে আনন্দ ও উৎসব করব, কিন্তু যদি তাঁর এই পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্যই পূর্ণ না হয়, তাহলে আমাদের বড়দিন পালন শুধুই একটি কৃষ্টিগত প্রথা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়া আর কিছুই না। তাই বড়দিনের উৎসবে যেন সকল মানুষের অন্তরে, বিশেষভাবে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের অন্তরে, যিশু খ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তা জেগে ওঠে। পাপের পথ ছেড়ে পবিত্রতার পথে এগিয়ে যেতে, সত্য সুন্দর ও ন্যায্যতার পথে এগিয়ে যেতে তারা যেন সাহসী হয়ে ওঠে। মিলন ও ভ্রাতৃসমাজ গড়তে তারা যেন সকল প্রকার ত্যাগস্বীকার ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে চলতে পারে। শুধু নিজের আনন্দের জন্য নয়, বড়দিন হলো অন্যদের আনন্দ দানের উৎসব, এই কথা মনে রেখে যেন আত্মদান করতে পারে। তাহলেই বড়দিন হবে ভ্রাতৃত্বের উৎসব ও আনন্দ মিলনের উৎসব॥

যিশু খ্রিস্টের দেহধারণ : প্রৈরিতিক চেতনার জাগরণ

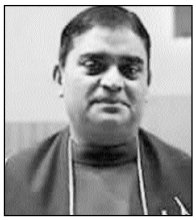

ফাদার নরেন জে বৈদ্য

পিতা ঈশ্বর জীর্ণতার বন্দীদশা থেকে মুক্তি করতেই তাঁর পুত্র যিশুকে ত্রাণকর্তারূপে প্রেরণ করেছেন। "আমাদের প্রতি পরমেশ্বরের ভালবাসা এতেই প্রকাশিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে এই জগতে পাঠিয়ে ছিলেন, যাতে তাঁর দ্বারাই আমরা জীবন লাভ করি" *(১ যোহন ৪:৯)*। "তুমি তার নাম রাখবে যিশু, কারণ তিনিই আপন জাতির মানুষকে তাদের পাপ থেকে মুক্ত করবেন" *(মথি ১:২১)*। খ্রিস্টের দেহধারণ আমাদের প্রৈরিতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। মানব ব্যক্তিকে মঙ্গলসমাচারের মূল্যবোধে রূপান্তরিত করতে, মানুষের অন্তর জগৎকে মঙ্গলসমাচারের আলোকে আলোকিত করতে ও গোটা জীবনটাকে খ্রিস্টীয়করণ করতে আমরা দায়বদ্ধ।

"বাণী একদিন হলেন রক্ত-মাংসের মানুষ; বাস করতে লাগলেন আমাদেরই মাঝখানে... সত্যিই তো আমরা সকলে তাঁর সেই পূর্ণতা থেকে লাভবান হয়েছি : লাভ করেছি অনুগ্রহ আর অনুগ্রহ" *(যোহন ১: ১৪, ১৬)*। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ৪০০ বছর ধরে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে প্রবাহিত হচ্ছে। বাংলাদেশের ৮টি ধর্মপ্রদেশ বাণী প্রচারেরই ফসল। খ্রিস্ট যেমন পরিত্রাণের কাজ সম্পন্ন করেছেন, মণ্ডলীও সেই পথ অবলম্বন করতে আহুত। যিশুর দেহধারণের চেতনা হলো মুক্তির চেতনা। মানুষ যেন মুক্তির স্বাদ পেতে পারে। শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে প্রচারাভিয়ান চলছে। খ্রিস্টমণ্ডলী গালিলেয়ার সাগরের তীর ছেড়ে সমস্ত মহাদেশের প্রান্তে পৌঁছেছে। সারা পৃথিবীতে প্রায় ৭শ কোটি লোক রয়েছে, শুধুমাত্র প্রায় ১৩০ কোটি কাথলিক খ্রিস্টভক্ত রয়েছে।

বাইবেলে যিশু খ্রিস্টের দেহধারণের প্রয়োজনীয়তা

প্রবক্তা ইসাইয়া বলেছেন, পৃথিবীর বুকে মঙ্গলময় ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে মুক্তিদাতার আবির্ভাব ঘটবে। তাঁকে বলা হবে 'ইম্মানুয়েল', অর্থাৎ "ঈশ্বর আমাদের সঙ্গেই আছেন" *(ইসাইয়া ৭:১৪, দ্র: মথি ১: ২৩)*। জেরেমিয় লিখেছেন : "তাঁর এই নাম রাখা হবে; 'ভগবানই আমাদের ধর্মিষ্ঠতা" *(জেরেমিয়া ২৩:৬)*। "যখন সময় পূর্ণ হল, তখন পরমেশ্বর এই পৃথিবীতে পাঠালেন তাঁর আপন পুত্রকে; তিনি জন্ম নিলেন নারী গর্ভে।... এমনটি ঘটেছিল, যাতে তিনি বিধানের অধীনে পড়ে থাকা যত মানুষের

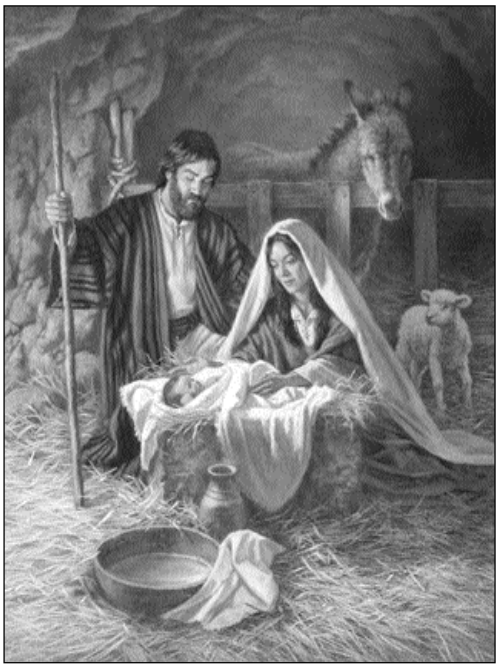

মুক্তিমূল্য দিতে পারেন, যাতে আমরা হয়ে উঠতে পারি পরমেশ্বরের পুত্র" *(গালাতীয় ৪:৪-৫)*। " খ্রিস্ট মরদেহ প্রকাশিত হলেন, স্বর্গদূতেরা দেখতে পেলেন তাকে, বিজাতীয়দের মধ্যে প্রচারিত হলেন তিনি, তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠল পৃথিবীর মানুষ" *(১ তিমথী ৩: ১৬)*।

খ্রিস্টের দেহধারণে দ্যুলোক-ভুলোক উৎসবমুখর

Christmas শব্দটি বিশ্লেষণ করলে পাই

A Child
Has been
Born for us
Son given
To us
Authority rests
Upon Him and

He is named
Jesus

বড়দিনে আমরা স্বয়ং অসীম ঈশ্বরের সসীম মানবরূপে জন্মগ্রহণের স্মরণ দিবস উদ্‌যাপন করি। ঈশ্বর এই পৃথিবীতে মানুষের মত মানুষের ঘরে জন্ম নিলেন যেন তিনি মানুষের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন। "আজ দায়ুদ নগরীতে তোমাদের জন্য এক এাণকর্তা জন্মেছেন তিনি খ্রিস্ট প্রভু *(লুক ২: ১০-১১)*। বড়দিনে তাই তো দ্যুলোক ভূলোক হয়ে উঠে উৎসবমুখর। তাই তো কবি রবীন্দ্রনাথ জীবনবোধ ও মানবিক চেতনায় আনন্দে আপ্লুত হয়ে গেয়েছেন : তাই তোমার আনন্দ আমার ওপর, তুমি তাই এসেছো নিচে, নইলে তোমার প্রেম হত যে মিছে।" যিশু খ্রিস্টের আগমনে আমাদের জীবনে সত্যিই কি কোন পরিবর্তন এনেছে? প্রভাব ফেলেছে? ঈশ্বর পুত্র মানুষ হয়েছেন যেন আমরা ঈশ্বর - সদৃশ হয়ে উঠি। ঈশ্বরে বাস করা, ঈশ্বর স্বরূপ হয়ে ওঠা আমাদের মুক্তি।

মানবাধিকার সংরক্ষণে ও শান্তি স্থাপনে প্রেরণকর্মীগণ

প্রবক্তা জাখারিয় বলেছেন, সেই যে রাজা আসছেন, তিনি হবেন নম্র, কোমল-হৃদয়, শান্তিপ্রিয় মানুষ। তাঁর রাজ্য পৃথিবীর সর্বত্রই স্থাপিত হবে" *(জাখারিয় ৯: ৯-১০)*। শান্তি দিতেই শান্তিরাজ যিশুর আগমন এই পৃথিবীতে। যিশু খ্রিস্টের দেহগ্রহণের ফলে শান্তি রসে ভরে উঠে পৃথিবী। যিশুর জন্মের সময় স্বর্গদূতবাহিনী গেয়ে উঠেছিল "জয় ঊর্ধ্বলোকে পরমেশ্বরের জয়! ইহলোকে নামুক শান্তি তাঁর অনুগৃহীত মানবের অন্তরে" *(লুক ২: ১৪)*। মানুষ হয়ে যিশুর এই পৃথিবীতে আসার একমাত্র উদ্দেশ্যই হল মানুষের সাথে মিলন ও একাত্মতা। "তিনি তো স্বরূপে ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে থাকতে চাইলেন না; বরং নিজেকে রিক্ত করলেন; দাসের স্বরূপ গ্রহণ ক'রে তিনি মানুষের মতো হয়েই জন্ম নিলেন" *(ফিলিপ্পীয় ২: ৬-৭)*। যিশু এই পৃথিবীতে আসলেন মানুষ যেন মর্যাদা পায়। আমাদের সমাজের বাস্তবতা-জন্মের কারণেই

আমরা মানুষকে দমিয়ে রাখি আবার মানুষকে উঠাই। জন্মের কারণে দাস পদবী মানুষ মর্যাদা দেয় না। সত্যি কথার অনুরোধে বলতে হয় যে, যাপিত জীবনে হৃদয়ের উন্মুক্ততা পরিলক্ষিত হয় না। যিশুর ন্যায় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায়, প্রেরণকর্মীগণ ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার কাজে সম্পৃক্ত রয়েছেন। মানুষের মাঝে শান্তি-সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

'ইম্মানুয়েল', অর্থাৎ "ঈশ্বর আমাদের সঙ্গেই আছেন"

একজন প্রেরণকর্মী বলেন-আমি আছি = যখন তুমি একা, যখন তুমি আতঙ্কগ্রস্ত, যখন তারা তোমাকে প্রত্যাখান করে ও তোমাকে তাড়িয়ে দেয়, যখন তুমি আর অগ্রগতি দেখতে পাও না, যখন তুমি উদ্বিগ্ন ও ভীত, যখন কেউ তোমাকে পছন্দ করে না, যখন তুমি মনে কর, তোমার ও তোমার বন্ধুর মাঝে একটি দেয়াল সৃষ্টি হয়েছে, যখন দুশ্চিন্তায় তোমার ঘুম আসে না, যখন তোমার প্রয়োজন ভালবাসার, তুমি বিশ্বাস সহকারে কিছু বলার জন্য প্রস্তুত, যখন তুমি ভয়ানক বিপদের মধ্যে আছ, যখন তুমি অসুস্থ এবং তোমাকে সেবার প্রয়োজন, যখন তুমি আর একাকী দুঃখ সইতে পার না, যখন তোমার মাথার উপর জগৎ ভেঙ্গে পড়ে, যখন কেউ তোমাকে আঘাত করে, যখন তুমি ভয়ানক মনপীড়ায় কষ্ট পাও, যখন তোমার কথা আর কেউ শুনতে চায় না, যখন তুমি এত ক্লান্ত যে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পার না, যখন তুমি মন্দ বিবেক দ্বারা চালিত হও, যখন তুমি আমাকে ডাক। আমি সর্বদা তোমার সঙ্গে থাকবই।

খ্রিস্টের দেহধারণ তাগিদ দেয় পালকীয় যত্ন এবং প্রৈরিতিক কর্মতৎপরতায়

GOSPEL শব্দটি বিশ্লেষণ করলে পাই

G = God So loves the world that he gave his
O = Only
S = Son that whoever believe in Him should not
P = Perish but have
E = Everlasting
L = Life

খ্রিস্টের পরিত্রাণদায়ী কাজ কি আমাদের পরিত্রাণদায়ী কাজ? "প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থ ৬১: ১-২ পদ লুক ৪:১৮-১৯ পদ - জোর তাগিদ দেয় - অন্তর আত্মায় যিশুর মত হতে, অন্তরে বলিকৃত এবং দীনতম ভাইবোনদের হৃদয়ে, অন্তরে ও মনে বহন করতে। লুক ৪: ১৮-১৯ পদে যিশুর ৫টি প্রৈরিতিক মিশন ও কার্যক্রম (Mission statement) ব্যক্ত হয়েছে : ১-তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীনদরিদ্রের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করতে, ২- বন্দীর কাছে মুক্তি ৩- অন্ধের কাছে নবদৃষ্টির কথা ঘোষণা করতে ৪- পদদলিত মানুষকে মুক্ত করে দিতে, ৫ প্রভুর অনুগ্রহদানের বর্ষকাল ঘোষণা করতে। প্রতিটি ধর্মপ্রদেশ যিশুরই গল্প বলে যাচ্ছে। বাংলাদেশে ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে ৫ লাখ খ্রিস্টবিশ্বাসী বাইবেলের আলো ও লবণের *(দ্রঃ মথি ৫: ১৩-১৫)* মতেই খ্রিস্টবিশ্বাসের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। প্রভুর বাণী ঘোষণা করতে, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশে বর্তমানে কর্মরত রয়েছে, মোট ৪১৬ জন ফাদার। (৮টি ধর্মপ্রদেশে ২৩৩ জন ধর্মপ্রদেশীয় যাজক এবং ১৮৩ জন ৮টি ব্রতধারী যাজক সংঘে), ১২১৮ জন সিস্টার (২১টি সিস্টাদের ধর্মসংঘ) এবং ১২৫ জন ব্রাদার (৭টি ব্রতধারী ব্রাদারদের ধর্মসংঘ)

উপসংহার

যিশু খ্রিস্টের দেহধারণ কি দাবী করে? প্রতিদিনই আমাদের জীবনে খ্রিস্ট জন্মগ্রহণ করতে পারেন যদি আমরা খ্রিস্টের জীবনাদর্শ অনুসরণ করি অর্থাৎ সততা, ন্যায্যতা ও প্রেমের পথে জীবন-যাপন করি। মনে হয় এই অর্থেই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন-"যেদিন সত্যের নামে ত্যাগ করেছি, যেদিন অকৃত্রিম প্রেমে মানুষকে ভাই বলতে পেরেছি, সেই দিনই পিতার পুত্র আমাদের জীবনে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই দিনই বড়দিন - যে তারিখেই আসুক"।

প্রতিদিন আমি কিভাবে খ্রিস্টের ন্যায় জীবন যাপন করি? মঙ্গলসমাচার প্রচারের একজন এজেন্ট হিসেবে আমরা কি দরিদ্র ভাই-বোনদের প্রতি অনুরাগী ও মনোযোগী? আমরা খ্রিস্টের শিক্ষায় সেবায়, কর্মে, মতে ও আর্দশে দীক্ষিত। এজেকিয়েল ঘোষণা করেছেন, মেষপালক যেমন সমস্ত ব্যাপারে মেষগুলির যত্ন নিয়ে থাকে, তিনিও (যিশু) তেমনি তাঁর হাতে তুলে- দেওয়া সকলেরই যত্ন নেবেন। তিনি হবেন সকলেরই একমাত্র পালনকর্তা *(এজেকিয়েল ৩৪:২৩-২৪)*। যিশু খ্রিস্টের ন্যায় প্রেরণকর্মীগণ কি মানব উন্নয়ন অগ্রগতির চিন্তায় বিভোর? আমরা কি যিশু খ্রিস্টের ন্যায় মুক্তি যজ্ঞে নিবেদিত মানুষ? খ্রিস্টের বাণীদূত যেন খ্রিস্টের সৌরভ" *(২ করি ২: ১৫)*। "খ্রিস্টের মুক্তিদায়ী কাজ শেষ হয়নি। পৃথিবীর মানুষ যতদিন থাকবে ততোদিন মুক্তিদায়ী কাজ চলতে থাকবে। "খ্রিস্টের হাত নেই, আজকের জগতে কাজ করার জন্য তাঁর একমাত্র উপায় আমাদের হাত। খ্রিস্টের পা নেই, তাঁর পথে মানুষকে চালিত করতে তাঁর একমাত্র সম্বল আমাদের পা। খ্রিস্টের মুখ নেই, আজকের মানুষের কাছে নিজের কথা জানানোর জন্য তাঁর আছে আমাদের মুখ"॥ ৯

বিবেক মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন

প্রকাশিত হচ্ছে বড়দিন-২০ উপলক্ষে পি আর প্ল্যাসিড-এর ২৫টি ছোট গল্প এক মলাটে, "বড়দিনের গল্প" গ্রন্থ। বিভিন্ন মিশনে বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

যারা লেখালেখি করছেন তাদের জন্য সুখবর, আমরা অতি যত্নের সাথে বই প্রকাশনার কাজ করি। যোগাযোগ করুন।

হেলেনা বাড়ৈ
প্রকাশক
(বিবেক মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন)
ঠিকানা: সেক্টর ৭, রোড ৭, হাউজ ৬, উত্তরা
ফোন: ০১৭১১১২৯৬৫৯
ই-মেইল: bibekpublishers@gmail.com

গোশাল ঘর থেকে নেয়া বড়দিনের বাণী

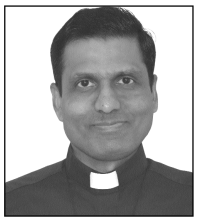

ফাদার অরুণ উইলিয়াম রোজারিও ওএমআই

আধুনিক বড়দিন উৎসব পালনের কথা মনে করলেই ক্রিসমাস ট্রি, গোশাল ঘর, আলোক সজ্জায় সজ্জিত গির্জা, কীর্তন, আতস বাজি ফোটানো, বিভিন্ন ধরণের পিঠা বানানো ও খাওয়ার কথা চলে আসে। তবে ছোটবেলায় আমাদের ধর্মপল্লী দিনাজপুরে থাকার সময় ক্রিসমাস ট্রি সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকলেও গোশাল ঘর সর্ম্পকে আমার গভীর আগ্রহ ছিল। আমরা সবাই জানি যে আসিসির সাধু ফ্রান্সিস *(১১৮১-১২২৬)* মধ্য ইতালির গ্রেচ্চো শহরে ১২২৩ খ্রিস্টাব্দ প্রথমবারের মত এই গোশাল ঘর তৈরি করেন। পোপ অনোরিয়াস তার আশীর্বাদের মধ্যদিয়ে বড়দিনে এই গোশাল ঘর স্থাপনের প্রথাকে স্বীকৃতি দান করেন। বড়দিনে আমরা কিভাবে এই গোশাল ঘর থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি, এই লেখায় সে বিষয়টি সহভাগিতা করছি।

খুব সম্ভবত ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ বাংলাদেশ সরকার প্রথম দুই টাকার নতুন নোট চালু করে। সেই বছর বড়দিনের আগে বাবা আমাদের সব ভাই-বোনদের প্রত্যেকে নতুন দুই টাকার নোট দেন যেন আমরা বড়দিনের দিন খ্রিস্টযাগের পর গোশাল ঘরে গিয়ে শিশু যিশুকে চুম্বন করি এবং এই নতুন টাকা দান করি। এর আগের বড়দিনে সব সময় পয়সা বা এক টাকার নোট দিয়ে শিশু যিশুকে চুম্বন করেছি। তাই নতুন দুই টাকার নোট পেয়ে খুবই খুশী ছিলাম। বড়দিনে গোশাল ঘরে শিশু যিশুকে চুম্বন ও পাশে নতুন দুই টাকার নোট দিয়ে এক ধরণের গর্ববোধ ও আত্মতৃপ্তি পেয়েছিলাম। দিনাজপুর ক্যাথিড্রাল গির্জার বড় গোশাল ঘরটি তৈরি করা হতো গির্জার পাশে মা-মারীয়ার গ্রটোর নীচে। আর মা-মারীয়ার গ্রটোর সেই অংশে দিনের বেলাতেও আলো প্রবেশ না করাতে তা ছিল বেশ অন্ধকার। তাই সেই গোশাল ঘরে সাজানো রাখাল, গরু, মেষ, অনান্য প্রাণী এবং সাধু যোসেফ ও মা-মারীয়ার মূর্তিগুলো খুব সহজে চোখে পড়তো না। তবে পাশ থেকে একটি বাতির আলো সরাসরি শিশু যিশুর উপর পড়াতে সবার আগে এই শিশু যিশুকে দেখা যেত। এই শিশু যিশুকে দেখার পর ধীরে-ধীরে অন্যান্য মূর্তিগুলোর ওপর চোখ পড়ত। স্কুল জীবনে দিনাজপুরের সেই গোশাল ঘর দেখার স্মৃতি মনে করিয়ে দেয় যে বড়দিন মানেই প্রভু যিশুকে সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান দেওয়া এবং তাকে দেখা ও নিজেদের জীবনে ধারণ করা। প্রভু যিশু আমাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু গোশাল ঘর দর্শন আমাদের সেই শিক্ষা-ই দেয়।

গীতাবলী পুস্তকে মতিলাল দাসের কথা ও সুশীল বাড়ৈ এর সুর দেয়া এবং প্রবক্তা ইসাইয়া গ্রন্থ হতে নেওয়া "আঁধারে ছিল যে জাতি পেল মহাজ্যোতি.." গানটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতি বছর ২৪ ডিসেম্বর মধ্যরাতের খ্রিস্টযাগের প্রথম পাঠে *(ইসাইয়া ৯:১-৬)* আমরা এই বাণী শুনে থাকি। ছায়াচ্ছন্ন দেশে যারা বাস করছিল, তাদের উপর ফুটে উঠেছে একটি আলো। আমাদের জন্য যে শিশু জন্ম নিয়েছেন, তাঁকে ডাকা হবে অনন্য পরিকল্পক, পরাক্রমী ঈশ্বর। ন্যায় ও ধর্মিষ্ঠতা হবে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত এই ভাবী রাজ্যের মূল বৈশিষ্ট্য। শান্তিরাজের রাজত্বকালে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম পুড়িয়ে ফেলা হবে। বড়দিন যে প্রত্যেকের অন্তরে আশার আলো সঞ্চারের দিন, বাইবেলের পবিত্র বাণী সে কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

আলো ও অন্ধকারের বিষয়টি নিয়ে আরো একবার চিন্তায় এসেছে যখন আমি ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ শ্রীলংকায় নভিশিয়েটে যাত্রা করতে প্রথমবার বিমানে উঠি। লক্ষ্য করি যে বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণের সময় পাইলট প্লেনের ভেতরের আলো নিভিয়ে দেন বা আলো অনেকটা কমিয়ে দেন। কিন্তু প্লেনের ভেতর অন্ধকার হলেও, জানালা দিয়ে বাইরের অংশ আমরা যেন আগের থেকে আরো ভালভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। এটি ঠিক যেমন রাতের বেলায় গাড়ীর চালক গাড়ির ভেতরে কোন আলো না রেখে, গাড়ির হেড লাইট জালিয়ে রাস্তা আলোকিত করে গাড়ীকে গন্তব্যের পথে পরিচালনা করেন। প্লেন বা গাড়ীর বাতি যেমন যাত্রাপথকে আলোকিত করে ঠিক সেইভাবে ঈশ্বরের বাণী আমাদেরকে পরিচালিত করে, যেন আমরা জীবন পথে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই। গোশাল ঘরের একটি বাতি যেমন সরাসরি শিশু যিশুকে আলোকিত করে, একইভাবে ঈশ্বরের বাণী আমাদেরকে ঈশ্বরের পথে পথ চলতে আহ্বান করে। বড়দিন হলো ঈশ্বরের এই ডাক শোনার দিন।

রোমে অবলেট সম্প্রদায়ের জেনারেল হাউজে প্রায় ৬০ বছর ধরে একজন ইতালিয়ান ব্রাদার কাজ করেছেন। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ ৯৭ বছরে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত, এই ব্রাদার রোমের গির্জাগুলোতে যেতেন, মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করতেন ও দান বক্সে দান করতেন। বড়দিনকালে বেশ কয়েকবার আমি তার সাথে বিভিন্ন গির্জায় গিয়েছি এবং বিভিন্ন গোশাল ঘর দেখেছি। তিনি বলতেন আসলে প্রতিটি গির্জায় গিয়ে যেভাবে পবিত্র বেদীর সামনে, কিংবা ক্রুশবিদ্ধ প্রভু যিশু বা মা-মারীয়া ও অন্যান্য সাধু-সাধ্বীর মূর্তি বা প্রতীকির সামনে প্রার্থনা করা উচিত, একইভাবে বড়দিনকালে নির্মিত প্রতিটি গোশাল ঘরের সামনে নতজানু হয়ে ধ্যান ও প্রার্থনা করা উচিত। তার মতে বড়দিনের খ্রিস্টযাগের পাঠগুলো গোশাল ঘরের সামনে পাঠ করা উচিত। তার এই উপদেশবাণী শুনে, আমি আমাদের নিজেদের চ্যাপেলে গোশাল ঘরের সামনে একাকী বাইবেল পাঠ ও ধ্যান করেছি। সে থেকে মনে হয়েছে, আমি যেন কিছুটা হলেও বড়দিনের তাৎপর্য আগের থেকে কিছুটা বেশি অনুধাবন করতে পেরেছি। এই অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি যে, আমরা যদি এই বড়দিনকালে যে কোন গির্জায় প্রবেশ করে গোশাল ঘরের সামনে একাকী প্রার্থনাপূর্ণ সময় কাটাতে পারি, তাহলে আমরা বড়দিনের তাৎপর্য আরো গভীরভাবে বুঝতে সক্ষম হব।

গোশাল ঘরের সামনে এই একাকী ধ্যান করার সময় আমার মনে হত এই শিশু যিশু ঈশ্বরপুত্র হলেও এই শিশু অবস্থায় সে সম্পূর্ণরূপে তার মা ও পালক পিতার ওপর নির্ভরশীল। বাইবেলে যিশুর ঘুমানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে শুধু একবার যখন তিনি নৌকায় গালীল সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন। "তখন হঠাৎ প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় উঠল আর ঢেউ এমনভাবে নৌকার ওপর আছড়ে পড়তে লাগল যে, তা জলে ভরে যাবার উপক্রম হল। যিশু কিন্তু পেছনের দিকে নৌকার গদিটার ওপর মাথা রেখে তখন ঘুমোচ্ছিলেন" *(মার্ক ৪:৩৭-৩৮)*। এর পরের ঘটনা আমরা সবাই জানি যে শিষ্যেরা যিশুকে জাগিয়ে তুললে, তিনি বাতাস ও সাগরকে ধমক দেন ও শান্ত করেন। তবে বাইবেলে উল্লেখ না থাকলেও আমার কল্পনা করতে ভাল লাগে যে গোশাল ঘরে শিশু যিশু যেন এক গভীর ঘুমে নিমগ্ন। তার পাশে মা-মারীয়া ও পালক পিতা সাধু যোসেফ চিরজাগ্রত। তারা এই শিশুকে সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবে। এই থেকে আমরা সহজেই বলতে পারি যে, মা-মারীয়া ও সাধু যোসেফ যেভাবে শিশু যিশুর পাশে থেকে রক্ষা করেছেন, একইভাবে আমাদেরকে রক্ষা করবেন। আমরা সবাই জানি যিশু যেভাবে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করে, ঝড় থামিয়ে শিষ্যদের বলেছিলেন, "এত ভয় কিসের? এখনও কি তোমাদের মধ্যে বিশ্বাস জাগেনি?" ঠিক একইভাবে আজও প্রভু যিশু আমাদেরও আশ্বস্ত করছেন, জীবন সমুদ্রে যত ঝড়ই আসুক না কিনা, তিনি আমাদের সাথেই আছেন।

গোশাল ঘর দর্শন করে রাখালদের কাছ থেকে আমরা শিখতে পারি কীভাবে স্বর্গদূতের সংবাদ পেয়ে তারা তাদের পালের পশুগুলিকে রেখে ছুটে গিয়ে যাবপাত্রে শোয়ানো শিশু যিশুকে খুঁজে বের করল, শিশুটি সম্পর্কে স্বর্গদূত যা বলেছিল তারা তা জানিয়ে দিল এবং ঈশ্বরের জয়গান গাইতে-গাইতে ফিরে গেল। আমাদের উচিত বাহ্যিক অনুষ্ঠান, খাবার-পানীয়, মোবাইল, কম্পিউটার অত্যাধিক ব্যবহারের অভ্যাস হতে বেরিয়ে এসে প্রভু যিশুর কাছে ছুটে যাওয়া। গোশাল ঘরে রাখা জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণও আমাদের প্রভুর পথে চলতে ও উদার হতে শেখান। তারা যেভাবে প্রাচ্য দেশ হতে রাতের আঁধারে উদিত উজ্জ্বল তারা দেখে যুদেয়ার বেথলেহেম নগরে আসেন এবং স্বর্ণ, ধুনো ও গন্ধনির্যাস উপহার দিয়ে শিশু যিশুকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেন, আমাদেরও উচিত বাইবেলের বাণীপাঠ ও শ্রবণ করে প্রভুর পথে যাত্রা করা। তারা যেমন শিশু যিশুকে মূল্যবান উপহার দিয়েছিলেন, আমাদেরও সাধ্য অনুযায়ী গরিব-দুঃখী ও অসহায় মানুষের জন্য কিছু করা উচিত। বড়দিনের আনন্দ যাতে গরিব ও অসহায় মানুষের পরিবারে পৌঁছতে পারে, তার দায়িত্ব আমাদের সবার। কারণ যিশু নিজেই বলেছেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমার এই তুচ্ছতম ভাইদের (ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, বিদেশী, বস্ত্রহীন, পীড়িত, কারারুদ্ধ) একজনের জন্যে তোমরা যা-কিছু করেছ, তা আমারই জন্য করেছ" *(মথি ২৫:৩৯)*। অন্তিম বিচারের দিন আমরা সবাই চাই যে প্রভু যিশু যেন আমাদের বলেন, "এসো তোমরা, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যারা। জগতের সৃষ্টির সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের দেওয়া হবে বলে রাখা আছে, তা এবার তোমরা নিজেদেরই বলে গ্রহণ কর" *(মথি ২৫:৩৪)*।

বড়দিনে এই গোশাল ঘর দর্শন করে আমরা যেন স্মরণ করি দু'হাজার বছর পূর্বে বেথলেহেম-এর রাখালদের কাছে আবির্ভূত স্বর্গদূতের সেই বাণী, "ভয় পেয়ো না। আমি এক মহাআনন্দের সংবাদ তোমাদের জানাতে এসেছি; এই আনন্দ জাতির সমস্ত মানুষের জন্যেই সঞ্চিত হয়ে আছে। আজ দাউদের নগরীতে তোমাদের ত্রাণকর্তা জন্মেছেন- তিনি সেই খ্রিস্ট, স্বয়ং প্রভু। এই চিহ্নে তোমরা তাঁকে চিনতে পারবে; দেখতে পাবে কাপড়ে জড়ানো, জাবপাত্রে শোয়ানো এক শিশুকে" *(লুক ২:১০-১২)*। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই বড়দিনে গোশাল ঘরের প্রতিটি মূর্তি বা চরিত্র ধ্যান করে আমরা বড়দিনের তাৎপর্য আরো গভীরভাবে বুঝতে সক্ষম হবো॥

নব রাজার আগমন

পার্নিল গমেজ

নিঝুম রাতে সংবাদ এলো
মা-মারীয়ার প্রসব বেদনার,
শিশু-যিশুর শুভাগমন হলো
সেই ছোট্ট গোশালায়।
মহাদূতের সংবাদ শুনে
ছুটল রাখালগণ তারই পানে,
ভক্তিভরে করল প্রণাম
নতুন রাজার চরণে।
নব তাঁরার উদয় হলো উর্ধ্বাকাশে
পণ্ডিতগণ বুঝতে পারল,
নতুন রাজার এই ধারাতে জন্ম হয়েছে।
হঠাৎ তারা সংবাদ পেলো
নবরাজা রয়েছে গোশালাতে,
ছুটে গেল তারা নবরাজাকে প্রণাম
জানাতে।
নিয়ে গেল সাথে করে তারই জন্যে,
স্বর্ণ, ধূপধূনো, গন্ধ-নির্যাস তারই
আগমনে।
মহা জয়ধ্বনির উল্লাসের সুরে
নত মস্তকে করল প্রণাম তারই চরণে,
এলেন তিনি মানব বেশে এই ধারাতে,
ধন্য হলো মানব জীবন
তারই আগমনের পরশে ॥

বড়দিন বড় হবার দিন

ডঃ সিস্টার মেরী হেনরীয়েটা এসএমআরএ

প্রতিবারের ন্যায় এবারও সময় পরিক্রমায় আমাদের মাঝে উপনীত হলো আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত প্রভু যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন অর্থাৎ 'বড়দিন'। বড়দিন বললেই আমাদের মনে যেন একটি আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। অন্তরে যেন নতুন একটি চেতনা ফিরে পাই। আর সেক্ষেত্রে এবারের বড়দিন সত্যিই আমাদের নিকট অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, বর্তমানের এই বৈশ্বিক মহামারী অর্থাৎ কোভিড-১৯ এর মধ্যেও পরম পিতা আমাদের প্রত্যেককে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং তার পুত্রের জন্মদিন পালন করার ও আশিস লাভের সুযোগ দিচ্ছেন। তা ভাবলে সত্যিই আমরা অতি ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী।

বড়দিন আসলেই অত্যন্ত বড় ও মহৎ একটি দিন যার কোন পরিমাপ নেই। কেন এ দিনটি এত বড়? কীভাবেই বা বড় তা যদি সত্যিই আমরা একটু অনুধ্যান করি, তাহলে সহজেই বুঝতে পারব এবং সে সাথে এর মাহাত্ম্য ও উপলব্ধি করতে পারব।

যিনি এ বিশ্বের স্রষ্টা, অধিপতি, যিনি আমাদের অস্তিত্ব দিয়েছেন তিনি আমাদের জন্য এ ধরায় পাঠালেন তার প্রিয় পুত্রকে আর তিনি এলেন অত্যন্ত দীনবেশে মানুষরূপে। আর কোথায় তিনি জন্ম নিলেন? –জীর্ণ কুটিরে ছোট্ট গোয়াল ঘরে–আর এখানেই তার মাহাত্ম্য, এখানেই তার সর্বশ্রেষ্ঠত্ব। তিনি আমাদের জন্য নিজেকে ধূলায় লুটিয়ে দিলেন যেন আমরা তাকে অতি নিকটে পাই আর সেজন্যই তিনি ধরাতে এলেন দীনবেশে, ছোট্ট গোশালায় যা অতি আশ্চর্য ও মহৎ বিষয়, যা আমরা অনুধ্যান করেও শেষ করতে পারব না। আর সেজন্যই যিশু খ্রিস্টের এ জন্মদিন আমাদের বড়দিন কারণ এদিনে ঈশ্বর মানুষ হয়ে দীনবেশে জন্ম নিলেন যাবপাত্রে। তাই ঈশ্বরের সাথে হলো মানুষের সংযোগ স্থাপন।

ঈশ্বর হয়েও তিনি হয়েছেন অত্যন্ত নম্র, দীন যা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। যিশুর জন্ম সংবাদ প্রথম স্বর্গদূত রাখালদের কাছে পৌঁছে দেন যারা ছিল খুবই দরিদ্র ও অন্তরে দীন। এমন একজন রাজার জন্ম হলো যাকে পূর্ব দেশের তিন পণ্ডিত এসে উপহারসহ প্রণাম করে যায়। তাহলে এ দিনটির মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য অনেক অনেক গুণ বেশি যা আমরা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারব না। প্রিয় ভাইবোনেরা যে, দিনটিতে ঈশ্বর পুত্র মানুষ হলেন, দীনবেশে আমাদের ধরায় নেমে এলেন সে দিনটি যে কত বড় এবং এর মাহাত্ম্য যে কত বেশি তা আজ আমরা সত্যিই হৃদয়-মনে উপলব্ধি করছি। সে সাথে গভীরভাবে উপলব্ধি করছি যে, এ দিনটি আমাদের কাছে অনেক বড় আবেদন রাখে, নতুন চেতনা নিয়ে আমাদের মধ্যে সাড়া জাগায়।

ঈশ্বরপুত্র মানুষ হয়ে দরিদ্রবেশে এ পৃথিবীতে জন্ম নিলেন যেন আমরা ধনী হতে পারি, বড় হতে পারি। আর কিভাবে আমরা বড় হবো? কীভাবে আমরা ধনী হবো? বড়দিন বড় হবার দিন সেই চেতনা নিয়েই আজ প্রভু যিশু আমাদের মাঝে এলেন। তিনি আমাদের প্রত্যেকের জীবনের এক উজ্জল আদর্শ। তিনি আমাদের মাঝে দীনতার বেশে বড় হতে চান এবং আমাদের প্রত্যেককে বড় করে তুলতে চান।

তিনি ঈশ্বর থেকে মানুষ হলেন এর বিশেষ দিকটি হলো তিনি চান আমরা যেন হৃদয়-মনে পরিবর্তিত হই। পুরোনো আমিত্বকে ত্যাগ করে নতুন মানুষে পরিণত হই। তিনি পরিধান করলেন বিনম্রতাকে অর্থাৎ অত্যন্ত দীনবেশে জীর্ণ গোশাল ঘরে জন্ম দিলেন যেন আমরা তার দীনতায় ধনী হতে পারি অর্থাৎ আমাদের হৃদয় মনে নম্র হয়ে দরিদ্র অসহায় মানুষকে আমাদের জীবনে গ্রহণ করি। আমাদের অহমবোধ ও আমিত্বকে কাটিয়ে মানুষকে নিজ জীবনে বড় করে দেখি। 'বিনম্রতার বসন পড়ে যেন একে-অন্যের কাছে যাই, হয়ে উঠি একমন এক প্রাণ' যেমন সাধু পৌল বলেছেন। আমার ও প্রতিবেশির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে যেন কোন দূরত্ব না রাখি, নম্র হৃদয়ে যেন অন্যকে গ্রহণ করি।

উন্মুক্ত হৃদয় নিয়ে অন্যের কাছে যাই এবং খোলা হাতে অন্যের জন্য ভাল কিছু করি। দরিদ্র ভাই-বোনদের পাশে দাঁড়াই। তাহলেইতো গোয়াল ঘরে দরিদ্র যিশুকে আমি অত্যন্ত কাছে পাব। নম্রতার গুণে তার চরণের স্পর্শ পাব। তার সান্নিধ্য লাভ করতে পারব।

যখনই আমি নম্রতা পরিধান করব, উন্মুক্ত ও উদার হৃদয়ে অন্যের কাছে যাব এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব, নিজের চেয়ে অন্যকে বড় বলে গ্রহণ করব-তখনইতো আমার হৃদয় হবে প্রসারিত-আমি হবো সবচেয়ে বড়- যা পরিমাপ করা যাবে না। যা কেবলমাত্র হৃদয়রাজ খ্রিস্টই উপলব্ধি করতে পারবেন। আর সে দীনতা ও নম্রতা নিয়েই আমি গোশালার যিশুকে চুম্বন করতে পারবো এবং যিশুর আশিস লাভ করতে পারবো। আর যখনই আমরা আমাদের জীবনে এ শিশু যিশুর স্পর্শ পাব তখনই উপলব্ধি করতে পারবো যে যিশু আমার হৃদয়ে জন্ম নিয়েছেন আর তখনই আমি হয়ে উঠব যিশুর মত বড় ও মহৎ। এমনিভাবেই বড়দিন আমাদের প্রত্যেককে বড় হবার সুযোগ করে দেয় দরিদ্র যিশুকে নিজের জীবনে আন্তরিকভাবে গ্রহণ ও অনুসরণ করার মধ্যদিয়ে।

যখনই আমি সমস্ত কিছুকে বাদ দিয়ে নম্র ও বিনীত হৃদয়ে তার নিকট আশীর্বাদ লাভের জন্য যাব, তখনই তিনি আমাকে তার দীনতায় উচ্চে তুলে ধরবেন এবং আমার হৃদয়ে বাস করবেন আমার হৃদয়ের রাজা হিসেবে। আর এমনিভাবে বড়দিন আমাদের প্রত্যেককে বড় করে তোলে- এগিয়ে নিয়ে যায় প্রভু যিশুর ভালবাসার সান্নিধ্যে। এমনি একটি আবেদন নিয়ে আমরা দৃঢ় পদক্ষেপে বিনীত অন্তরে রাজাধিরাজ শিশু যিশুর কাছে জীর্ণ গোশালায় এগিয়ে যাই যিনি আমাদের হৃদয় সিক্ত করবেন তার জন্মদিনের অফুরন্ত ভালবাসায়, ভরে দিবেন আমাদের জীবন অনাবিল আনন্দ ও শান্তিতে॥

যিশুর দেহধারণ : নিস্ব হয়ে পূর্ণ হওয়া

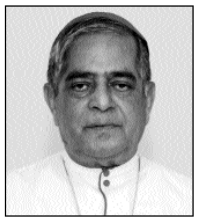

বিশপ থিয়োটনিয়াস সিএসসি

বড়দিন খুব সহজ একটি নাম, তবে খ্রিস্টবিশ্বাস ও খ্রিস্টীয় ভক্তির জীবনের অনেক গভীর তত্ত্বকথা ও ভক্তিকথা এক সাথে গুছিয়ে নিয়ে সহজ করেই বলা হয়েছে দিনটি প্রভু যিশুর জন্মদিন হিসেবে সত্যই বড় একটি দিন। আমাদের ছোট-বড় সবার প্রতিদিনের বিশ্বাস ও ভক্তি দিয়ে আমরা কত সহজেই মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে বলতে পারি যে, বেথলেহেমের গোয়াল ঘরে যাবপাথে শায়িত মাতা মারীয়ার ঐ শিশুটি অনন্তকালীন ঈশ্বরপুত্র, যিনি মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন পৃথিবীতে, আর যিনি বেথলেহেমে দীনবেশে এসে ঐ জীবন সমাপ্তিতে আরও অভাবনীয় দীনবেশে জেরুশালেমে ক্রুশের উপর জীবন সমর্পণ করলেন জগতের পরিত্রাণ এনে দিতে।

বড়দিনে পৃথিবীতে স্বর্গের ঈশ্বর ও পৃথিবীর মানবের মাঝে, তথা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে দুইটি অভাবনীয় বড় ঘটনা শুরু হল: একটি হল, যে স্বর্গের অনন্তকালীন ঈশ্বরপুত্র মর্তের রক্ত-মাংসের মানবের জীবন গ্রহণ ও ধারণ করলেন, ঈশ্বরপুত্র মানবপুত্র যিশু হলেন; মহিমময় ঈশ্বরপুত্র ক্ষুদ্র মানবপুত্র হলেন। আর দ্বিতীয়টি হল, যে এই ঈশ্বরপুত্র-মানবপুত্র যিশু জীবন শেষে ক্রুশের অপমানজনক ঘৃণ্য মৃত্যুবরণ করে নিকৃষ্টতম মানবজীবন-অবস্থা গ্রহণ করলেন। দুই ধাপে যিশু ক্ষুদ্র হলেন: ঈশ্বরপুত্র থেকে ক্ষুদ্র মানবপুত্র হলেন; মানব হয়ে শেষে ক্ষুদ্রতম মানবপুত্র হলেন। তা পার হয়ে তিনি পিতার দ্বারা মহিমান্বিত হলেন। এমন দৃঢ় যিশুকে নিয়ে তাঁর জন্মদিন বড়দিন বটে। যিশুর জীবনের এই কঠিন তত্ত্বকথা আমরা বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে খুব সহজ জীবন-কথা রূপে বুঝতে পারি। তাই বড়দিনে আমাদের যথার্থ সহজ আনন্দ।

যিশুকে নিয়ে এই দুইটি ধর্মশিক্ষা বিশ্বাস ও ভক্তিতে যত সহজ মানব জ্ঞান ও বুদ্ধিতে, দর্শনে তত সহজ নয়: কীভাবে বা কেন এক ঈশ্বর একক না হয়ে বরং অনাদিকালীন জাত পুত্র এবং আত্মাকে নিয়ে ত্রিত্বে এক ঈশ্বর? তার চেয়ে আরও কঠিন, কীভাবে অনাদিকালীন ঈশ্বরপুত্র মানবদেহ ধারণ করে প্রকৃত মানব হতে পারেন? আরও আবার কী করে এই ঈশ্বর-মানবপুত্র ক্রুশের জঘন্য মৃত্যুবরণ করতে পারেন? আদি মণ্ডলীতে এসব নিয়ে বহু মত ও আলোচনা হয়েছে। তবে ঈশ্বরের সত্তা পরিপূর্ণ জীবন সত্তা : পার্থিব ও পারমার্থিক, যুগ ও কাল এবং অনন্তকাল -- সমস্ত কিছুর অন্তর-আত্মা ঈশ্বরে স্থাপিত: এর সবকিছুর মধ্যে আনাগোনা করা ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব। কোনভাবেই মানবের সীমিত দর্শন দ্বারা তাঁকে সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় না। ঈশ্বরের গভীর হৃদয়-সত্তা মানুষ নিজে থেকে জানতে-বুঝতে পারে না। তবে একমাত্র পুত্র যিনি পিতার ক্রোড়ে বিরাজমান তিনি মর্তে মানুষ হয়ে এসে আমাদের মাঝে বাস করলেন *(যোহন ১: ১৪)*; এবং তিনি তাঁকে প্রকাশ করলেন (যোহন ১:১৮)। যিশুর মধ্যদিয়ে ততটুকু আমরা জানলাম।

ঈশ্বর-পুত্রের মানব দেহধারণ: আপন ঈশ্বরত্ব থেকে নিস্ব হওয়া মর্তের মানবের জন্য, মর্তের সবারই জন্য বড়দিন অভাবনীয় আনন্দের দিন, কেননা স্বর্গের ঈশ্বর-পুত্র মানব হয়ে মর্তে নেমে এলেন: মর্তে ঈশ্বর-বিহীন "খালি" স্থানটি ঈশ্বর পুত্রকে দিয়ে ভরে গেল। মর্তলোকে আমরা ঈশ্বর পুত্রকে পেয়ে হাজার অর্থে লাভবান হলাম।

তাতে স্বর্গে কী ঘটল? আমাদের খুব সাধারণ অনুভূতিতে বলা যেতে পারে যে, "স্বর্গ ঈশ্বরপুত্র-বিহীন" হল, স্বর্গ যেন পুত্র থেকে নিস্ব হল। স্বর্গ-মর্তকে নিছক স্থান হিসেবে ধরলে উপরের কথাটি তেমন অর্থপূর্ণ না-ই বা হবে। তবে ঈশ্বরের অন্তর জীবন যদি ধরি, তবে জানি যে যিশু মানুষ হয়ে ঈশ্বর-পুত্র রইলেন বটে, তবে নিজ ঈশ্বরত্বকে ধরে রাখলেন না, যেন তিনি পূর্ণ মানবত্বে চলতে পারেন; আবার মানবত্বেও তিনি ঊর্ধ্বদিক ধরে না রেখে বরং নিস্বতম মানব হয়ে জীবন ধারণ ও সমাপণ করলেন, কেননা ক্রুশ-মৃত্যুতে তাঁর মানবীয় উজ্জ্বলতম রূপ *(সাম ৪৫:২)* নিস্ব-কুৎসিত হয়ে দেখার মত আর রইল না, যা হয়ে থাকে পৃথিবীর নিস্বতম অপমানিত মানবের জীবনে *(পুণ্য শুক্রবারের ধ্যান)*।

ফিলিপীয়দের কাছে পত্রে সাধু পৌল বিষয়টি অতি উত্তম ধ্যানরূপে ব্যক্ত করেছেন: "তিনি স্বরূপে ঈশ্বর হলেও ঈশ্বরের সমান থাকা সাগ্রহে ধারণ করা বিবেচনা করলেন না; বরং নিজেকে রিক্ত করলেন, দাসের রূপ ধারণ করলেন ও মানুষের সাদৃশ্যে জন্মিলেন; এবং মানুষের স্বরূপে দৃশ্যমান হয়ে নিজেকে অবনত করলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত, এমন কি ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য হলেন" *(২:৬-৮)*।

কথাটি আরও এগিয়ে নিয়ে তিনি ২য় করিন্থীয় পত্রে বললেন: "তোমরা আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের অনুগ্রহ জান: তিনি ধনবান হলেও তোমাদের জন্য দরিদ্র হলেন, যেন তোমরা তাঁর দারিদ্রে ধনবান হও" *(৮:৯)*।

নিস্বতায় ও দারিদ্র্যে ধনবান হওয়া:

পৃথিবীতে আমাদের সবারই "বড় হয়ে যাওয়া" জীবনের সাধারণ প্রত্যাশা: আমরা জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রতিপত্তি, মান-সম্মান, কাজ-কর্ম, জাগতিক ধন-সম্পদ, এমনকি আধ্যাত্মিক জীবনেও বড় হয়ে যেতে চাই। তবে অনেক পেয়েও কেবলই আরও পাওয়ার অস্থিরতা নিয়ে আমরা ভিতরে ভিতরে কেবলই "অভাবী" থেকে যাই; আবার আমার অনেক আছে মনে করে অহম-চেতনার অহংকারে নিজের "আমি"-কে নিয়ে নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাই, সীমিত হয়ে যাই। তখন অন্তরে কেবলই চিন্তা-চেতনা, "আরও যেন পাই"; আরও এই বোধ, "আমি ছাড়া আর কেহ নাই"। তখন আমরা সত্যই অভাবী মানুষ হয়ে যাই। তাই তো যিশু আমাদেরকে নিজের জীবন ত্যাগ করতে বলেছেন, নিজের থকে শূন্য হতে বলেছেন, যেন "পাই-পাই" অভাবী চেতনা থেকে মুক্ত হই, এবং নিজেতে সীমিত না থেকে অন্য সবাইকে বড় করে দেখতে পাই। আর তখন আমরা "আমার সব আছে" আর "সবাই আছে" চিন্তা মগ্ন হই।

বাংলা ভাষায় "শূন্য" শব্দটির অর্থ গভীর

বটেঃ "সু"-ভাবে (অর্থাৎ ব্যাপক বা পরিপূর্ণভাবে) "ঊণ" (অর্থাৎ কম) যাহা, তা "শূন্য"। শূন্য মানে নয় "কিছুই নয়", বরং "নিজে আছে, কিন্তু নিজের কিছু নয়"। আমার কিছু আছে বললে, তা অনেক কিছু হলেও আমরা সেই কিছু দ্বারা সীমিত হয়ে যাই; আর আমার নিজের কিছু নেই বললে আমি অফুরন্ত অসীম হয়ে যাই। তাই শূন্য মহাশূন্য হয়ে আছে : তার কেন্দ্র আছে, তবে পরিধি বা সীমানা বলে কিছু নেই; শূন্য অসীমভাবে উন্মুক্ত, বিরাট ও বিস্তারিত। নিজে নিস্ব বা শূণ্য হলে আমরা ঐভাবে উন্মুক্ত ও বিস্তারিত হই।

যিশু মর্তে মানব দেহধারণ করে ঈশ্বর রইলেন, তবে ঈশ্বরত্বতে "ঊণ" হয়ে মানবত্বে পরিপূর্ণভাবে সক্রিয় হলেন, মানব জীবনের ক্ষুদ্রতম ধাপ পর্যন্ত মানুষ হলেন, যেন দীনতম মানুষও তার জীবন থেকে বাদ না পড়ে। আমাদের মানবীয় অনুভূতিতে বলা যেতে পারে যে, তিনি ঈশ্বরত্বে "কম" হয়ে তা আমাদের সাথে সহভাগিতা করলেন। তাতে ঈশ্বরপুত্র ঈশ্বরই থাকলেন, তবে মানুষও হলেন; আর মানুষ-মানুষ থাকল, তবে ঈশ্বরত্বও লাভ করল।

যিশু ঈশ্বরত্বে নিস্ব ও দরিদ্র হয়ে আমাদেরকে আমাদের জীবনেও নিস্ব ও দরিদ্র হওয়ার শিক্ষা দিলেন; সুসমাচারে তিনি তা-ই বলে গেছেন। আমাদের জীবনটাকে যদি আমরা অনেক জিনিস দিয়ে ভরে রাখি, তবে সেখানে আর কিছুর জন্য স্থান যে আর থাকে না, তা তখন সীমিত হয়ে যায়, ছোট হয়ে যায়; আর জীবনটাকে যদি "খালি" করে রাখি, তবে তা মহাশূণ্যের মত আরও উন্মুক্ত ও বিরাট হয়ে আসে, যেখানে সবকিছু রাখার পরও বহু খালি থেকে যায়। তখন তা অসীম হয়।

সুসমাচারে একটি উদাহরণ আছে: একটি লোক তার সব খালি গোলাবাড়ি বহু শস্য দিয়ে ভরে নিয়ে আরামে আনন্দে দিন কাটাবে বলে পরিকল্পনা করেছিল; তবে তাকে মূর্খ বলে তিরস্কার করা হলো, কেননা সেই রাতেই যে তার প্রাণ তার আসল ধনই সে হারাতে চলছিল।

বস্তুত আমাদের জীবনের সমস্ত কিছুই "দেনা-পাওনা" স্বরূপ, সকলই যেন "দেওনা" আর "পাওনা", দেবার বিষয় আর পাবার বিষয়; রাখার অর্থাৎ জমা রাখার মত কিছু নয়। জমা রাখলেই বাসি হয়, নিরস হয়, নষ্ট হয়। আমাদের জীবনটা যেন একটি পাত্রমাত্র, একটি বড় খালি উন্মুক্ত পাত্র: তাতে যা আছে সবই পাওয়া, তথা পাওনা; আর যা পেয়েছি সবই আবার দিয়ে দেবার বিষয়, তথা দেনা। আমরা যতই পাই, তবু ভরে যাই না; আর আমরা যতই দেই, তবু দীনহীন হই না। আমরা যা পাই বা যা দেই তা গুণে শেষ করে দিতে হয় না, তা অগণিত রাখতে হয়।

আমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদে অতি চমৎকারভাবে জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছতে পারি। আর তখনও নিস্ব হয়ে ধনবান হওয়ার সুন্দর একটি চেতনা ও অনুভূতি আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ হবে। কেননা জীবনের শেষে এসে আমরা আমাদের বহু সুন্দর কীর্তি-কর্মের জন্য ধন্যবাদ ও প্রশংসার অনুভূতিতে বিভোর হতে পারি; তা সুন্দর অনুভূতি হবে বৈকি। তবে আরও সুন্দর ও পবিত্র আনন্দ-অনুভূতি হবে, যখন এতকিছু করার মধ্যেই বুঝব যে শুধু সামান্যই করা হল, সবটাই যেন না-করা বাকী রয়ে গেল। তা তখন জীবনের নিস্বতার সবচেয়ে গভীর পবিত্র অনুভূতি এনে দিবে; অতিশয় বিনয়ের সাথে বলা যাবে, "সবটুকুই করলাম মন-প্রাণ দিয়ে, সামান্যই করা হল তাতে", তখন তৃপ্তচিত্তে হাসিমুখেই বলা যাবে "ক্ষমা করো মোরে।" সেই ক্ষমা প্রার্থনার মধ্যে নিরানন্দ নয় বরং প্রশান্তি ও আনন্দ থাকবে।

অষ্টকল্যাণ বাণীতে আছে: "বিনয়ী যারা ধন্য তারা, তারা পৃথিবী অধিকার করবে" *(মথি ৫:৭)*। বিনয়ী মানুষ অন্তরে এমনই নিস্ব হয় যে, সে "আমি নেই, শুধু তুমি আছ" চিন্তায় বিভোর হয়, মগ্ন হয়; তখন তার অন্তর মহাশূণ্যের মত বিরাট হয়ে প্রকাশিত হয়; আর তখন সকলেই সেই বিরাটের মধ্যে প্রবেশ করার সাহস পায়, অধিকার পায়; সেখানে প্রবেশ করে আরাম ও সান্ত্বনা পায়। এভাবেই বিনয়ী হৃদয় সবার চিত্তকে জয় করে নেয়।

যিশু আরও বলেছেন, "যার অনেক আছে, তাকে আরও দেওয়া হবে; আর যার নেই, তার যা আছে তাও নিয়ে যাওয়া হবে।" এর অর্থ হয় যে, যার অনেক আছে সেই সব কিছু দিয়ে অন্তরে আরও বিরাট হতে পারি; আর যার অল্প আছে সে কৃপণের মত তা জমা করে রাখতে রাখতে সেইটুকুও নষ্ট করে ফেলে, হারিয়ে ফেলে। নিস্ব হয়েই আমরা প্রকৃত অর্থে ধনবান হওয়ার সম্ভারনায় প্রবেশ করি॥ ৯

ত্রাণকর্তা

জেমস সুধীর সমদ্দার

পাপীর মুক্তির কারণ
ধরাতলে হ'ল যিশুর আগমন,
প্রতি বছর আসে বড়দিন
হৃদয়টা কি রয়েছে মলিন?
জীবনটা প্রায় করেছি পার
কতটুকু পাপ কমেছে আমার,
ঝলমলে বাতি পোষাকের বাহারত্রাতাকে
কি দিব উপহার?
তরুণ প্রজম্মের ভাই-বোনদের বিনয়ের সুরে শুধাই,
আজ থেকে তোমাদের আচরণে
কেহ দুঃখ না পায় ভাই।
আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে মোদের গায়,
ধর্মীয় বিধি-বিধান মানা যে বড় দায়।
পবিত্র শাস্ত্রের বাণী আছে জানা ও মুখস্ত,
পালনে কতটুকু আমরা আছি অভ্যস্থ?
জ্ঞান বিদ্যা-বুদ্ধি তিনি দিয়েছেন ভুরি-ভুরি,
পূণ্যের ঘটটি কি শূন্য কিসের এত বাহাদুরী?
যিশু তোমায় ভালবাসি মুখে-মুখে বলি,
হৃদয়ের খবর নিলে সেখানে কি শুধুই কালি?
মন্দের সাথে যিশু কখনও করে না বাস,
আমরা নিজেরা নিজের করছি সর্বনাশ।
মাথা থেকে পা ঘষিয়া পরিষ্কার করছি বারে বার,
বেলা শেষ হয়ে এল আত্মাটি ঘষা হল না একবার।
ভাইয়ের সাথে নেই মিল, প্রতিবেশির সাথে বিবাদ,
যিশু কি করে করবেন আমাদের আশীর্বাদ?
লৌকিক ধর্মে-কর্মে আছি আমরা রত,
সুন্দর হৃদয়টা করছি ক্ষত অবিরত।
যেখানে মানুষের বসতি সেখানেই দোকান,
শান্তির বেঁচা-কেনা হয়েছে কি অবলোকন?
শান্তির অন্বেষণে আমরা হন্যে হয়ে ঘুরি,
পাপকে পূঁজি করায় পূণ্য যায় আমায় ছাড়ি'।
প্রভু আমরা পাপি, পাপ করি হরহামেশা
ক্ষমা করে গ্রহণ কর, এ মোদের আশা।
ভালবাসার সঠিক সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া মুশকিল
মুখ ও অন্তরের কথায় নেই তেমন মিল।
অনেক ভাল লোক লোভলালসায় পড়ে
বাহিরের দুটো গেছে অন্তরেরটাও মরে-মরে।
মনের মন্দিরে মোরা পেতেছি আসন
তুমি এসে গ্রহণ কর মোদের এ জীবন।
যিশু তোমার জন্মতিথিতে হৃদয়টা সাজাই
এ জীবনে যেন আর পাপের পথে না যাই॥

বড়দিনের আনন্দময় ধর্মতত্ত্ব : ঐশমানবিকতা

ড. ফাদার তপন ডি'রোজারিও

সুখের বড়দিন, মেরি খ্রিস্টমাস, বন নাতালে, জয়ে নূয়েল, ফেলিচে নাভিদাদ, ফ্রুইলিখেচ্ ভাইনাখতেন সমার্থক হাজারো শুভসূচক শব্দ কিংবা পঙতিমালায় খ্রিস্ট জন্ম মহোৎসব শুভেচ্ছার কত না ছড়াছড়ি। উপহার ছাড়াও বহুমাত্রিক মাদকতায় এ উৎসব আর আনন্দ সবাইকে কাছে টানে। বড়দিন, খ্রিস্টমাস, নাতাল, নাভিদাদ, নূয়েল, ভাইনাখ্তেন ছাড়াও এই খ্রিস্ট উৎসবের সেরা ও যৌক্তিক নামটি হতে পারতো 'দা ফিস্ট অব ইনকারনেশন' অর্থাৎ ঈশ-মানব দেহধারণ উৎসব। সন্দেহ নেই খ্রিস্টমাসকেন্দ্রিক ইতিহাস, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব আর খ্রিস্টতত্ত্ব মিলে মিশে চার্চ ও তার বিশ্বাসী ভক্তজনদের নিয়ে গেছে এক অনন্য আপ্ত-বাক্য আর আপ্ত-কর্মের মিলন তুঙ্গ জ্ঞানমার্গে, বিশ্বাসের পরম আখন্দে। বড়দিনে আসলে আমরা ঐশ দেহধারণ বা ইনকারনেশনের জন্যই ঈশ্বরের প্রশংসা গান করি ক্যারল-কীর্তন, খ্রিস্টযজ্ঞ আর তৎসংশ্লিষ্ট নানাবিধ ভক্তি রীতিকৃত্যে; দেশীয় আর আন্তর্জাতিক মিশেলে। তাই জয় হোক আনন্দময় ধর্মতত্ত্বের, জয় হোক খ্রিস্ট স্মরণের সমূদয় বিস্ময়কর নিশিথ কাহন আর অভাবিত ঐশকীর্তির অংশগ্রহণ আর সাক্ষ্যদানে।

১। খ্রিস্টীয় ইতিহাস যিশু খ্রিস্টের দেহধারণ প্রশ্ন

অতি সংক্ষেপে বলা যায় যে, তিনটি মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে চার্চের ইতিহাসে যিশু খ্রিস্টের জন্মকেন্দ্রিক ধর্মতত্ত্ব আবর্তিত হয়েছে: যিশু খ্রিস্টের দেহধারণ কেন প্রয়োজন ছিল? ঈশ্বর মানুষ হলেন অর্থ কী? আর খ্রিস্টীয় ইতিহাসে এ রহস্যময় তত্ত্বটি কীভাবে বুঝানো বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

২। খ্রিস্ট তত্ত্বীয় গোঁড়ামী বা ভ্রান্ত মতবাদ, বিশ্বাস ও শিক্ষা *(৩২৫-৫০০ খ্রিস্টাব্দ)*

৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে মাতামণ্ডলী ও মণ্ডলীর পিতৃগণ চারটি ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে খ্রিস্টকেন্দ্রিক কয়েকটি মহাসভা করে (কনস্টান্টিনোপল, এফেসুস, কালসিদন) ভ্রান্ত মতবাদ বা গোঁড়ামী বিদূরিত করেন। চারটি গোঁড়ামী হলো:

২.১ দসেতিসিজম: খ্রিস্ট প্রকৃত মানুষ ছিলেন না- এ মতবাদ। অন্য কথায় মানবত্বহীন খ্রিস্টবাদ।

২.২ এ্যাপোলিনারিয়ানিজম: এই মতবাদ বলে যে যিশুর মানব আর ঐশ প্রকৃতি এক সঙ্গে একই ব্যক্তিতে থাকতে পারে না।

২.৩ নেস্তরিয়ানিজম: নেস্তরিয় মতবাদ প্রচার ও বিশ্বাস করে যে, যিশু দুইজন আলাদা ব্যক্তি। একটি মানুষ অপরটি ঈশ্বর।

২.৪ মনোফিসিজম: খ্রিস্টের এক স্বভাববাদ বিশ্বাস; অদ্বৈত স্বভাববাদ। হয় ঈশ্বর নয় মানুষ। হয় মানুষ নয় ঈশ্বর।

ইতিহাসে খ্রিস্টের মানবতা সংক্রান্ত তার্কিক বিষয় সমাধান আসে বাইবেল, দর্শন আর ধর্মতত্ত্ব ভিত্তি করে। প্রমাণ করা হয় যে, ত্রিত্ব বা ত্রিব্যক্তিতে এক ঈশ্বর: প্রকৃতি ও ব্যক্তি ভিন্ন কিন্তু এক। খ্রিস্টও ব্যক্তি ও স্বভাব-প্রকৃতিতে আলাদা হলেও এক ও অভিন্ন।

৩। ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে ধর্মতাত্ত্বিকভাবে সমাধান, সৃজিত ত্রিশব্দ

ইনকারনেশন, হাইপোস্টাটিক ইউনিয়ন ও থেয়ান্দ্রোপাস্ এই তিনটি ব্যাখ্যাধর্মী শব্দ ব্যবহার করে নিরাকার ঈশ্বরের সাকার ধারণের রহস্যটি আলোচনা, ব্যাখ্যা, প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৩.১ ইনকারনেশন: প্রভু যিশু খ্রিস্টের মানব দেহধারণ তত্ত্ব। নিরাকার হয়েও আকার গ্রহণ। ধারণ কারণ: "বাণী হলেন রক্তমাংসের মানুষ"। বাইবেলীয় উৎসই জানায় যে খ্রিস্ট মানব প্রকৃতি গ্রহণ করেছিলেন।

৩.১.১ ভার্জিন বার্থ: কুমারী থেকে জাত, নিষ্পাপ জন্ম। যিশুর জন্ম নিষ্কলঙ্কা মারীয়া থেকে। মায়ের মত যিশুও আদিপাপ বিবর্জিত।

৩.১.২ কেনোসিস: নিজেকে রিক্ত বা শূণ্য করা। ঈশ্বর হয়েও যিশু নিজেকে রিক্ত করেছেন মানুষকে ভালবেসে, পাপ থেকে পরিত্রাণ দিতে স্বর্গ থেকে মর্তে এসে সব মানুষের জন্য সবকিছু করেছেন এমন কী নিজ জীবনও সমর্পণ করেছেন।

৩.১.৩ ইমপেক্কাবিলিটি: পাপশূন্যতা বা অপাপবিদ্ধতা। পাপ ব্যতীত তিনি আমাদের মত মানুষ ছিলেন।

৩.২ হাইপোস্টাটিক ইউনিয়ন: স্বভাবগত ভেদ, ব্যক্তিগত অভেদ। খ্রিস্ট একজন ব্যক্তি যিনি অনন্তকাল ধরেই বিরাজমান দুটি পূর্ণ স্বভাব বা প্রকৃতি নিয়ে: ঐশ প্রকৃতি এবং মানব প্রকৃতি। মূল বিষয়টি হলো খ্রিস্টে দুটি প্রকৃতির একত্রে মিলনের একটি ধর্মতাত্ত্বিক যৌক্তিক বর্ণনা। এক ব্যক্তিতে আছে দুই স্বভাব।

৩.৩ থেয়ান্দ্রোপস্: ঐশমানব বা মানবেশ্বরসুলভ। খ্রিস্টের ধর্মতাত্ত্বিক নাম এ সত্যতা সমর্থন করে যে তিনি 'গড-ম্যান' অর্থাৎ ঐশমানব।

৪। মথিমতে যিশু খ্রিস্টের জন্মকাহিনী

"যিশু খ্রিস্টের জন্ম এভাবে হয় : তাঁর মা মারীয়া যোসেফের প্রতি বাগ্দত্তা হলে তাঁরা একসঙ্গে থাকার আগে দেখা গেল, তিনি গর্ভবতী পবিত্র আত্মার প্রভাবে। তাঁর স্বামী যোসেফ যেহেতু ধর্মনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন, আবার তাঁকে প্রকাশ্যে নিন্দার পাত্র করতে অনিচ্ছুক ছিলেন বিধায় তাঁকে গোপনেই ত্যাগ করতে সঙ্কল্প নিলেন। তিনি এ সমস্ত ভাবছেন, এমন সময় দেখ, প্রভুর দূত স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, "দাউদ সন্তান যোসেফ, তোমার স্ত্রী মারীয়াকে গ্রহণ করে নিতে ভয় করো না, কেননা তাঁর গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে . . ." *(মথি ১:১৮-২০)*।

যিশু খ্রিস্টের জন্মবৃত্তান্ত সাধু মথি ও লুকের লেখায় সংক্ষিপ্ত এবং হৃদয়গ্রাহী হলেও সে বাইবেলীয় বৃত্তান্তের বিষয়বস্তু খ্রিস্ট মণ্ডলীতে যুগে-যুগে, কালে-কালে আলোচিত ও সমালোচিত হয়েছে বড় নির্দয়ভাবে, নানা প্রেক্ষিতে, নানা বৌদ্ধা কর্তৃক, একক কিংবা দলীয়ভাবে। যিশু খ্রিস্টকে নিয়ে সমূদয় ভ্রান্ত মতবাদ মাতামণ্ডলীর পিতৃগণ কর্তৃক অথবা একাধিক মহাসভা আর অখণ্ডনীয় ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তিতে সঠিক উত্তরদানে সত্য শিক্ষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

পপুলার বা জনপ্রিয় মঙ্গলসমাচার রচয়িতা মথির বাইবেলীয় আখ্যান আদি খ্রিস্টমণ্ডলীতে ভক্তদের বিশ্বাসের জীবনে প্রত্যাশার নানা আবেদনপূর্ণ করেছিল, কারণ এখানে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে খ্রিস্ট জন্মোৎসবের এক সবিশেষ আনন্দময় ধর্মতত্ত্ব। খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ সত্য লুকিয়ে আছে এখানে।

প্রথমত: সাধু মথির মঙ্গলসমাচার লক্ষ্য ছিল তাঁর স্বজাতি ইহুদীদের আশ্বস্ত করা বা বিশ্বাস করানো যে নাজারেথের ইয়েসূয়া বা যিশুই হলেন সেই মশীহ্ বা খ্রিস্ট তথা অভিষিক্ত জন। মথি ব্যাখ্যা করে বলেছেন কেন তাঁর কলমে প্রথম ১৭টি পদে তিনি দেখিয়েছেন যে, যিশু "আব্রাহামের সন্তান" আবার "দাউদেরও সন্তান"।

১৮ পদে নিরাকার ঈশ্বরের আকার সংক্রান্ত ক্রিয়া-কলাপের শুরু। নিষ্কলঙ্কা গর্ভধারণের মাধ্যমে, মথি সকলের সামনে তুলে ধরেন কীভাবে যিশু প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থে উল্লিখিত মানবজাতির ত্রাণকর্তা সংক্রান্ত ভাববাণীর সংশোধন: "তাই প্রভু নিজেই তোমাদের একটি চিহ্ন দেবেন। দেখ, যুবতীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্র প্রসব করবে, তাঁর নাম রাখবে ইম্মানুয়েল।" *(ইসাইয়া ৭:১৪)*।

দ্বিতীয়ত: এই পাঠ্যাংশ যিশুই যে প্রতিশ্রুত মশীহ্ তা' নির্দেশ করে আরও প্রকাশ করে যে, যিশু খ্রিস্ট থেকেও আরও বেশি কিছু। ইসাইয়ার প্রতিশ্রুতি মতে তিনি হবেন ইম্মানুয়েল, অর্থাৎ ঈশ্বর "আমাদের সঙ্গে বর্তমান"। যিশু খ্রিস্ট হলেন ঈশ্বর। পবিত্র ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি। মথি ১:২১ নির্দেশ করে যে, খ্রিস্ট হলেন ঈশ্বর যাকে নাম দেওয়া হয়েছে ইয়েসূয়া বা যিজাস্ অর্থাৎ যিনি তাঁর জাতিকে তাদের কৃত পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।

যদি প্রশ্ন করা হয়: ঈশ্বর বিনা আর কেউ কি পরিত্রাণ দিতে পারে? সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ছাড়া আর কে পাপের ক্ষমাদান করতে পারেন? মথি তাঁর এই বক্তব্য দিয়ে সুস্পষ্ট করতে চান যে, যিশু মশীহ থেকেও আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই মানব দেহধারণকারী ঈশ্বর!

তৃতীয়ত: যিশু যেহেতু মারীয়া থেকে জাত, তাই যিশু খ্রিস্টের মানব স্বভাবধারী ধর্মতত্ত্বটি পক্ষ সমর্থন করতে পারি। পবিত্র শাস্ত্রের যিশু কোন অশরীরী প্রতীকরূপে প্রকাশিত চরিত্র নন যেমনটি দসেটিসিজমে আছে। যদি খ্রিস্ট মানব প্রকৃতি ধারণ বা গ্রহণ না করতেন, তাহলে তিনি আদমের পাপে নিপতিত বংশধরদের কখনো উদ্ধার করতে পারতেন না।

চতুর্থত: শাস্ত্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ও খুঁটিনাটি বর্ণনায় আছে শিশু যিশুর গর্ভাগমনে ঈশ্বরের ক্রিয়াশীল আত্মা। আত্মার এই কার্যটি যিশু খ্রিস্টের নির্দোষ-নিষ্পাপ থাকার সক্ষমতার বিষয়টি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। যিশু মানুষ হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন যোসেফ বংশকূলে।

পঞ্চমত: কেউ কেউ যিশু খ্রিস্টের গর্ভাগমন ঘটনাটিকে তথাকথিত "সেকেন্ড ক্রিয়েশন বা দ্বিতীয় সৃষ্টি" হিসেবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস নেন- অর্থাৎ যিশু মানব জন্ম নিয়েছেন দ্বিতীয় আদম হিসেবে। সৃষ্টির প্রথম মানব আদম যেমন কোন মানব থেকে জাত নয়, তেমনি খ্রিস্টও কোন মানব জাত নয়। ঈশ্বর আদিতে, এদেনের ভার্জিন বা অদূষিত মাটি থেকে প্রথম মানব আদম সৃষ্টি করেছিলেন। আর এখন এখানে, মানে আর্থ-এ মানব দেহধারণের বিশুদ্ধ মাটি বা অক্ষতযোনি নারী হলেন মারীয়া। তিনি নবীনা হবা। সৃষ্টির প্রথমা নারীকে নেওয়া হয়েছিল নর থেকে, আর এখন দ্বিতীয় মানব বা দ্বিতীয় আদম যিশু নামের নর'কে নেওয়া হলো নারী থেকে।

ষষ্ঠত: এই অনুচ্ছেদে আমরা দেখতে পাই যে, পবিত্রাত্মা কীভাবে কুমারী গর্ভে জীবন সঞ্চারে সক্ষম। এই চেতনায় ও যুক্তিতে মথি যোব ও সামগীতের শিক্ষায় নিহিত আত্মার মতবাদে একান্তভাবে বিশ্বস্ত কারণ সেখানে আত্মার সৃজনশীল শক্তি বা ক্ষমতার উল্লেখ আছে। যিশুর জন্ম আত্মার দ্বারা বিষয়টি মনের ওপর ছাপ রাখে এমনভাবে প্রকাশ করে প্রেরিতশিষ্য মথি প্রমাণ করেন যে পবিত্র আত্মা হলেন ঈশ্বর, আর ঈশ্বর হিসেবে তিনি যেখানে কোনকিছুর অস্তিত্ব নেই সেখানেও জীবন সৃষ্টি করতে পারেন।

সপ্তমত: এই পাঠ্যাংশে আরেকটি অতিরিক্ত প্রমাণ আছে যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর তা হলো আত্মার ঈশ্বরত্ব। যেমন তাঁর নাম আখ্যা দেওয়া হয়েছে পবিত্র আত্মা *(মথি ১:১৮, ২০)*, যিনি পবিত্র কিন্তু ঈশ্বর। বিশেষ অভিব্যক্তি "পবিত্র আত্মা" নবসন্ধিতে মথির কোন আবিস্কার নয় বরং প্রাচীন সন্ধি বা ইহুদী ধর্মগ্রন্থ তানাখ্ থেকে আগত *(সাম ৫১:১১; ইসা ৬৩:১০)*।

অষ্টমত: আরেকটি চূড়ান্ত লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, আত্মা কীভাবে দৈহিক বাস্তবতার মধ্যদিয়ে কাজ করেন যেমন মানব দেহ। যদি আত্মাই ইনকারনেশন বা দেহধারণ কারুকার্য বিনির্মাণ করেছেন, অতএব তিনি রক্ত-মাংসের জীবন ও জগতের সংস্পর্শেই আছেন। আত্মাকে মানুষের মন বা আত্মার এলাকায় নির্বাসিত করা যায় না।

খ্রিস্ট সম্পর্কে আমরা শাস্ত্রীয়ভাবেই জানতে পারি যে, তিনি কীভাবে আর কেমন করে মশীহ্, ঈশ্বর, মানুষ, নিষ্পাপ এবং নতুন আদম। আর আত্মা সম্বন্ধে বলা যায়, তিনিও সৃষ্টি করেন বিধায় তিনিও ঈশ্বর, তিনি পবিত্রদের পবিত্রতম তাই তিনিও ঈশ্বর, তিনি শুধুমাত্র "আধ্যাত্মিক" রাজ্যে কাজ করেন না, প্রাকৃতিক বা ভৌতিক জগতেও চিরন্তন ক্রিয়াশীল।

উপসংহার

যিশু খ্রিস্টের বাইবেলীয় জন্মবৃত্তান্ত গল্পের মত করে বলা হয়েছে, তাই বলে এটি কোন অলীক কাহিনী নয়। বেশিরভাগ গল্পেরই শুরু, মধ্য ও শেষ অংশ আছে কিন্তু যিশু গল্পের তেমন কোন ভূমিকা নেই। শাস্ত্র মতে, আদিতে তিনি ছিলেন 'ঈশ্বরের সঙ্গে' এবং তিনি নিজেই ছিলেন ঈশ্বর *(যোহন ১:১)*। যিশু বৃত্তান্ত একটি বাইবেলীয় সময়ের রেকর্ড যে যিশু ঈশ্বর হয়েই অস্তিত্ব নিয়ে আদিতেও ছিলেন, "তিনি রক্ত মাংসের মানুষ হলেন এবং বাস করলেন আমাদেরই মাঝে" *(যোহন ১:১৪)*।

প্রভু যিশু খ্রিস্ট তাঁর দেহধারণের মধ্যদিয়ে সবাইকে দিলেন একটি অনুকরণীয় আদর্শ। ঈশ্বর হিসেবে তিনি যেমন তাঁর ঐশসুলভ অধিকার ও লব্ধ সুযোগ-সুবিধাকে আঁকড়ে থাকেননি, তেমনি আমাদের মাইণ্ডসেটেও আত্মস্বার্থের বাইরে অপরের মঙ্গলকে প্রাধান্য দিতে হয়। আমাদের মানব জন্ম তাঁর জীবন গল্পের জন্ম, বাক্য, কর্ম, মৃত্যু, পুনরুত্থান ... প্রভৃতির সাথে এক ও অভিন্ন। সুখের বড়দিনে একটি অঙ্কের জয়ফুল ইনকারনেশন গল্প শেষ হলেও আমাদের জীবনের গল্প কখনও শেষ হবার নয়- কেননা ইহকাল আর পরকাল উভয়ই সবার জন্য অনুগ্রহ আর উপহার শাশ্বত।

ঐশ দেহধারিত যাবপাত্রে শায়িত প্রভুর সাথে সহভাগিতা ও মিলনের মধ্যদিয়ে, আমরা আমাদের আসল মানবিকতাকে পুনরুদ্ধার করি। সেলফ্ কেনোসিস বড় বেশি প্রয়োজন। 'অহম' বা আমিত্বকেন্দ্রিক মোহ-স্বার্থের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে পরার্থপর হবার চ্যালেঞ্জ অবিরাম। সর্ব জাতির আর সর্ব মানুষের জন্য সবকিছু হবার দায় মুক্তি প্রশ্নবোধক।

আমরা হাজার বছরের অতীত বাইবেলীয় আশ্চর্য সব ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হতে না পারলেও বর্তমান চার্চের পিতৃগণ, মহাসভা বা খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কর্তৃক সপ্রমাণকর মৌলিক অলৌকিক কাজ ইনকারনেশনের নিশ্চিত সাক্ষ্যদাতা হয়ে আছি, হতে পারি।

খ্রিস্ট জন্মোৎসব বড়দিন বা খ্রিস্টমাসও একটি গ্রেইট মিরাকল, তথা অনাদি অনন্ত ঈশ্বর কর্তৃক সাধিত অতি বিস্ম য়কর অলৌকিক ঘটনা নয় কী? আনন্দময় ধর্মতত্ত্ব ছিল, আছে আর থাকবে- আনুক্রমিক বৈশ্বিক বড়দিন আনন্দের আপ্ত অনুঘটক হয়ে। মেরী খ্রিস্টমাস এন্ড জয়ফুল ইনকারনেশন!

অভিবাসী, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি ও প্রান্তিকজনের পাশে বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী : পরিপ্রেক্ষিত কারিতাস বাংলাদেশ

জেমস গোমেজ

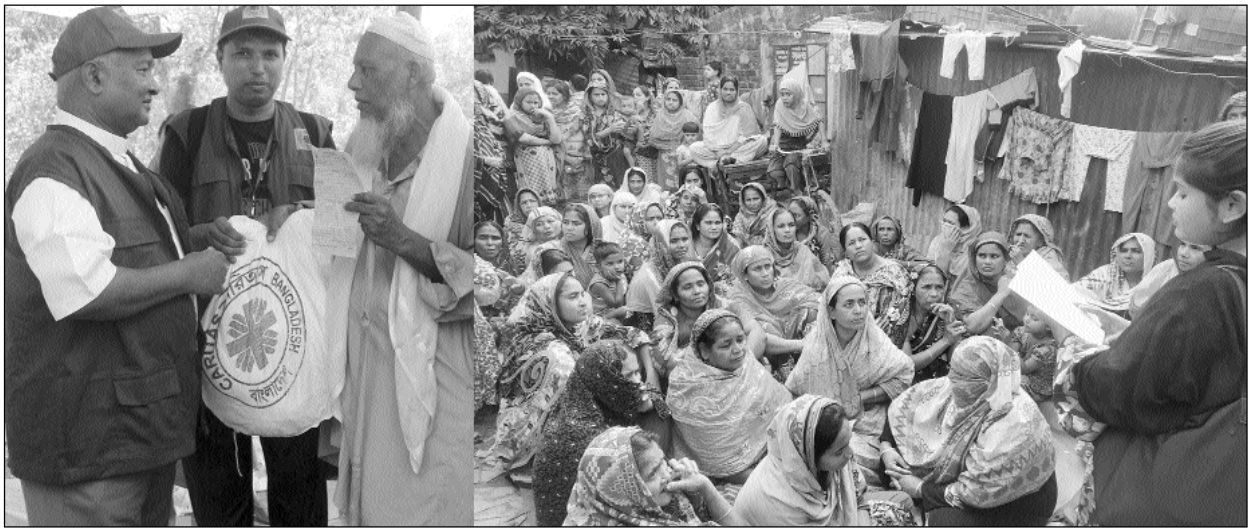

মানবসেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অতীতকাল থেকেই ধর্মযাজকগণ, বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ও সমাজসংস্কারকগণ ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সমাজসেবামূলক কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। পরবর্তীতে সমাজে সৃষ্ট জটিল সমস্যা সমাধানে এইসব প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র, বেকারত্ব, অধিক জনসংখ্যা, পুষ্টিহীনতা, পরিবেশদুষণ নিরক্ষরতা ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা সমাধান সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এসব ক্ষেত্রে সরকারের কার্যক্রমের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি পুর্নগঠনে বেশ কিছুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন যার মধ্যে কারিতাস অন্যতম। বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সংখ্যা দ্রুতবৃদ্ধি পাচ্ছে। সংখ্যার বৃদ্ধির সাথে সাথে কর্মপরিধিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ত্রাণ ও পুর্নবাসন কাজ থেকে শুরু করে দারিদ্র বিমোচন, মাইক্রো ক্রেডিট, পল্লী উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা, জেন্ডার সমতা আনায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, শিক্ষার বিস্তার, দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, সামাজিক বনায়ন এবং আইনগত সহায়তা প্রদানে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো সচেষ্ট। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে মানবিক সেবাদান, জরুরি সমস্যা মোকাবেলা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা।

অভিবাসী

এক দেশ থেকে আরেক দেশে পাড়ি জমানো মানুষদের আমরা বিভিন্ন নাম দিয়ে থাকি। এসব নাম আপনি বা আপনারা প্রায় শুনে থাকবেন: অভিবাসী, শরণার্থী বা আশ্রয় প্রার্থী। অভিবাসী সাধারণত এমন কাউকে বলা হয়, যিনি বা যারা উন্নত জীবনযাত্রা বা কর্মসংস্থানের খোঁজে স্থান পরিবর্তন করে থাকেন। অর্থাৎ, আপনি যদি বাংলাদেশের অধিবাসী হন এবং বছরে কয়েকমাস কাজের খোঁজে বা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ভারত বা নেপালে অবস্থান করেন, তাহলে আপনাকে অভিবাসী বলা যাবে। অন্য দিকে ভিনদেশে স্থায়ীভাবে যখন কেউ বসবাস করতে আসে তখন তাদের সাধারণত প্রবাসী বলা হয়ে থাকে। এই ধরনের মানুষ সাধারণত নিজের ইচ্ছাতেই নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে পাড়ি জমান। কর্মসংস্থান বা উন্নত জীবনের খোঁজের পাশাপাশি পারিবারিক বা ব্যক্তিগত কারণেও অনেকে স্থায়ীভাবে বিদেশে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন। জোর পূর্বক বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে নয়, স্বেচ্ছায় ও স্বতস্ফূর্তভাবে যারা স্থায়ীভাবে বিদেশে পাড়ি জমায় তাদের প্রবাসী বলা হয়ে থাকে। শরণার্থী বলা হয় এমন কোনো ব্যক্তিকে যিনি যুদ্ধ, গণহত্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এড়াতে দেশান্তরী হন। যে মুহূর্তে কোনো দেশ কাউকে শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি দেবে, তখনই তার নির্দিষ্ট কিছু অধিকারকেও স্বীকৃতি দিতে হবে দেশটির। শরণার্থীরা এমন পরিস্থিতির শিকার হয়েছে, যা তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। উপরের সবকটি প্রকারের মিশ্রণ হতে পারে একজন আশ্রয়প্রার্থী; তবে আশ্রয় প্রার্থীর বিশেষত্ব হলো, তিনি নিজ দেশ বাদে অন্য দেশে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুরক্ষার জন্য আবেদন করেন। ব্যাপক ঝুঁকি নিয়ে সমুদ্রপথে যারা সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করেন তাদেরকেই কেবল আশ্রয় প্রার্থী হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। আধুনিক যুগে অভিবাসী সংজ্ঞাটি আরো বিস্তার লাভ করেছে। বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরে কর্মসংস্থানের জন্য বা উদ্বাস্তু হয়েও এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পাড়ি জমালে

তাকেও অভিবাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরিণ অভিবাসন : ১৯০১ থেকে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৯০ বছরে বাংলাদেশে শহরের জনসংখ্যা ৩০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কেবল ৩ গুণ। ১৯৭৪ পূর্ববর্তী সময়ে বাংলাদেশের কোনো শহরের জনসংখ্যা ১ মিলিয়ন ছিল না। কিন্তু বর্তমানে রাজধানী ঢাকা ১০ মিলিয়ন জনসংখ্যা অধ্যুষিত একটি মহানগরীতে পরিণত হয়েছে। পরিচিতি পেয়েছে বিশ্বের অন্যতম মেগা সিটি হিসেবে। বিগত কয়েক বছরে নগর জনসংখ্যার অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, চারটি প্রধান শহরের (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা) আয়তন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। (সুত্র: বাংলাপিডিয়া) নগরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ৬০% ঘটে থাকে পুনঃবিভাজন সহকারে গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরের মাধ্যমে। প্রামাণ্য গবেষণা থেকে জানা যায় যে, সড়ক অবকাঠামো ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি এবং উৎপাদন, ব্যবসা, হোটেল, রেঁস্তোরা, গৃহায়ণসহ বিভিন্ন ধরনের নির্মাণের বিকাশ শহরগুলোতে অদক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি করেছে। তাই জীবিকার প্রয়োজনে এবং অধিকতর সম্ভাবনাময় চাকরির জন্য গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তদুপরি, অসম ভূমিব্যবস্থা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভূমিহীনতা জনসংখ্যার এ স্থানান্তর প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছে। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুসারে, গ্রামের উচ্চশ্রেণীর ১০% গৃহস্থ সেখানকার ৫১% জমির অধিকার নিয়ন্ত্রণ করে এবং তারাই গ্রামের মোট উপার্জনের ৩২% অংশীদার। নিম্নশ্রেণীর ৪০% জনগণের ভূমির ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং আয়ের অংশীদারিত্বের ভাগ যথাক্রমে ২% এবং ১৬%। এর ফলে বাকি তিন-চতুর্থাংশ ভূমিহীন জনগোষ্ঠী গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যায়। এছাড়া অনেক ভূমিমালিক গ্রামবাসীও বিভিন্ন উৎস থেকে উপার্জন বৃদ্ধির প্রত্যাশায় গ্রাম থেকে শহরে যায়। তবে এ ধরনের স্থানান্তরের অধিকাংশই অস্থায়ী প্রকৃতির।

কৃষিপ্রধান এলাকা থেকেই মূলত স্থানান্তর ঘটে এবং ঢাকা শহরেই অভিবাসীদের আগমন অধিক লক্ষ্যণীয়। পরিবারের অস্তিত্ব রক্ষার্থে এবং অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানে নতুন উপায়ে উপার্জনের মাধ্যমে পারিবারিক আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ আবর্তন ঘটে। ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা ও চট্টগ্রামে পোশাক শিল্প কারখানা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের শহরে অভিবাসন বেড়ে যায়। ১৯৭০-এর দশকে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রাধিকার এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব মানুষের গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরের প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে পরিসংখ্যানের দিক থেকে এ দুটি বিষয়ই ছিল নিতান্ত গুরুত্বহীন। অন্যদিকে ক্ষুদ্র পর্যায়ের জরিপে দেখা গেছে উচ্চশিক্ষিত ও অশিক্ষিত- এ দু'মেরুর পরিবারের শিক্ষার অগ্রাধিকারে এবং ঝুঁকি গ্রহণের সামর্থ্যে প্রভেদ ব্যাপক হলেও উভয় শ্রেণির পরিবার থেকেই নগরে অভিবাসনের মাত্রা প্রায় সমান।

জনসংখ্যার অধিক মাত্রার ঘনত্বই বাংলাদেশের অভিবাসনের ধারা নির্ধারণ করে না বরং অভিবাসীর প্রাপ্ত কাজ ও কাজের বৈচিত্র্যের সুযোগ, মাথাপিছু আয়, প্রাকৃতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের স্তর এবং কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্রিকীকরণ ইত্যাদি নিয়ামকের দ্বারাও অভিবাসন প্রক্রিয়া প্রভাবিত হয়। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর শহরাঞ্চলে আগমন ও শহর থেকে গ্রামে প্রত্যাবর্তনের মিশ্র ফলাফল লক্ষ্য করা যায়। তবে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কর্মসংস্থান এবং অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে অভিবাসনের ইতিবাচক প্রভাবই বেশি। সাময়িক অভিবাসীদের প্রেরিত অর্থ তাদের গ্রামে অবস্থানরত স্বজনদের কল্যাণার্থে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। বর্তমানে ঢাকা শহরের বস্তি এলাকায় বসবাসরত অভিবাসীরা তাদের উপার্জনের বেশিরভাগই ব্যয় করে পরিবারের খাবার এবং সন্তানের শিক্ষার জন্য।

শহরাঞ্চলে মৌলিক সামাজিক সুবিধা ও মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের অভাবে এবং এনজিওসমূহের অপ্রতুল সহায়তার কারণে দরিদ্র শহরবাসী, বিশেষ করে মহিলারা স্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত ঝুঁকির দিক থেকে বিত্তবানদের তুলনায় অধিকতর ভুক্তভোগী। গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনকারী দরিদ্রগৃহস্থরাও উচ্ছেদ, পেশিশক্তির অত্যাচার, ক্রমাগত অসুস্থতা, মহিলাদের ওপর যৌন হয়রানি ইত্যাদি কঠিন হুমকির সম্মুখীন হয়।

বড় শহরে গ্রাম থেকে ক্রমাগত অভিবাসনের ফলে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিবর্তে তা দারুণভাবে বিঘ্নিত হয় এবং সামগ্রিকভাবে শহরের অবকাঠামোগত অবস্থা ও পরিবেশের ওপর তার নেতিবাচক প্রভাব পরে। নগরের জনসংখ্যার দ্রুত ও ব্যাপক বৃদ্ধি উন্নয়নের ধারাকে ব্যাহত করে। তদুপরি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুবিধা সৃষ্টিতে কর্তৃপক্ষের

নারীর কর্মসংস্থানের সৃষ্টিতে ও শিশুশিক্ষা নিশ্চিতকরণে কারিতাসের অংশগ্রহণ

ব্যর্থতা, নাগরিক সুবিধা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব এবং সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের অদক্ষ ও অপর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিবেশগত সমস্যার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ, নিপীড়ন এবং সংঘাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে গৃহ ত্যাগ করা (বাস্তুচ্যুত) মানুষের সংখ্যা ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ৭ কোটি ছাড়িয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রায় ৭০ বছরের ইতিহাসে বাস্তুচ্যুতির এটিই সর্বোচ্চ রেকর্ড জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা-ইউএনএইচসিআরের হিসাবে। ইউএনএইচসিআরের গ্লোবাল ট্রেন্ড রিপোর্টের উপাত্ত অনুসারে, প্রায় ৭ কোটি ৮ লাখ মানুষ বর্তমানে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত। এ সংখ্যা ২০ বছরের মধ্যে দ্বিগুণ হয়েছে এবং গত বছরের তুলনায় এ বছর প্রায় ২৩ লাখ বেশি বৃদ্ধিপেয়েছে। বাস্তুচ্যুত এ মানুষের সংখ্যা থাইল্যান্ড বা তুরস্কের গোটা জনগোষ্ঠীর সমান। ইউএনএইচসিআর জানায়, সংখ্যার হিসেবে ৭ কোটি ৮ লাখ এখনো রক্ষণশীল, বিশেষ করে ভেনেজুয়েলার সংকটের চিত্র এখনও আংশিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে মাত্র। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে সব মিলিয়ে ৪০ লাখের মতো ভেনেজুয়েলান তাদের দেশ ছেড়ে পালিয়েছে, যার ফলে এটি সাম্প্রতিক বিশ্বে সবচেয়ে বড় বাস্তুচ্যুতির সংকট হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

জাতিসংঘের পরিসংখ্যানগুলোতে দেখা যায় যুদ্ধ, সংঘর্ষ ও নিপীড়ন থেকে নিরাপত্তার প্রয়োজনে মানুষের সংখ্যার দীর্ঘমেয়াদী এ ক্রমবর্ধমান প্রবণতা। যদিও শরণার্থী এবং অভিবাসীদের ঘিরে প্রায়শই বিভক্তিকর ভাষা বিদ্যমান, কিন্তু আমরা উদারতা এবং একাত্মতার উদ্দীপনাও দেখছি, বিশেষ করে সেই জাতিগুলির মধ্যে যারা নিজেরা বড় সংখ্যক শরণার্থীকে আশ্রয় দিচ্ছে। এছাড়া আমরা নতুন নতুন দাতা সংস্থা যেমন, উন্নয়ন সংস্থা, ব্যক্তিগত ব্যবসা এবং ব্যক্তি পর্যায়েরও অভূতপূর্ব অংশগ্রহণ দেখছি, যা শরণার্থীদের ওপরে গ্লোবাল কম্প্যাক্টের প্রেরণাকে কেবল প্রতিফলিতই করছে না, পাশাপাশি প্রতিদানও দিচ্ছে।

২০১৯ খ্রিস্টাব্দের গ্লোবাল ট্রেন্ডস রিপোর্টে ৭ কোটি ৮ লাখের যে সংখ্যা দেওয়া হয়েছে সেখানে তিনটি বড় দল রয়েছে। প্রথম দলটি হচ্ছে শরণার্থী, যার মানে হচ্ছে সেসব মানুষ যারা সংঘর্ষ, যুদ্ধ ও নিপীড়নের কারণে নিজের দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বব্যাপী শরণার্থীর সংখ্যা ২ কোটি ৫৯ লাখে পৌঁছেছে, যা ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের তুলনায় ৫ লাখ বেশি। দ্বিতীয় দলটি হচ্ছে আশ্রয়প্রার্থী। এরা সেসব মানুষ, যারা নিজ দেশের বাইরে অবস্থান করছেন এবং আন্তর্জাতিক সুরক্ষা গ্রহণ করছেন, কিন্তু শরণার্থী মর্যাদা পাওয়ার আবেদনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছেন। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের শেষ নাগাদ বিশ্বব্যাপী আশ্রয় প্রার্থীর সংখ্যা ৩৫ লাখ। তৃতীয় এবং সর্ববৃহৎ দলটি হচ্ছে সেসব মানুষ যারা নিজ দেশের ভেতরেই বাস্তুচ্যুত, যাদের সংখ্যা ৪ কোটি ১৩ লাখ। এ দলটিকে সাধারণত অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষ বলা হয়ে থাকে।

বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য যেভাবে সমাধান পাওয়া যাচ্ছে, এর চেয়েও বেশি হারে বাড়ছে সামগ্রিক বাস্তুচ্যুতির পরিমাণ। শরণার্থীদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো সমাধান হচ্ছে স্বেচ্ছায়, নিরাপদে এবং সম্মানের সঙ্গে স্বদেশে ফিরে যেতে পারা। অন্যান্য সমাধানের মধ্যে রয়েছে আশ্রয় প্রদানকারী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অন্তর্ভুক্তিকরণ অথবা তৃতীয় কোনো দেশে স্থানান্তরিত হওয়া। কিন্তু ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৯২ হাজার ৪০০ শরণার্থীকে স্থানান্তর করা গেছে। ৫ লাখ ৯৩ হাজার ৮০০ শরণার্থী নিজ দেশে ফিরে যেতে পেরেছেন এবং ৬২ হাজার ৬০০ জন স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পেয়েছেন।

বাংলাদেশে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি: মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগীরা হাজার হাজার রোহিঙ্গাদের হত্যা করে, গ্রামের অসংখ্য ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়, ব্যাপক যৌন সহিংসতা চালায়। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ২৫ আগস্ট থেকে প্রায় ৭ লাখ ৪০ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসেছেন। মানবিক এই বিপর্যয়ে রাষ্ট্র হিসেবে নানা সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়ায়। মানুষ হিসেবে মানবতার দাবি অনুযায়ী বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর থেকেই হাজার হাজার রোহিঙ্গা মুসলমান জনগোষ্ঠী আশ্রয় নেয় বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বের জেলা কক্সবাজারের বিভিন্ন উপজেলায়। তার মধ্যে টেকনাফ এবং উখিয়া অন্যতম। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ২৫ আগস্টের পর থেকে আসা রোহিঙ্গারা ছাড়াও ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে আরও ৮০ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন, এবং একই কারণে বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে আসা আরও প্রায় ৩ লাখ রোহিঙ্গা দশকের পর দশক ধরে কক্সবাজারে অবস্থান করছে। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে আসা দেশটির ১০ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর চাপ এখন বাংলদেশ বহন করে চলেছে। সর্বশেষ রোহিঙ্গা ঢলের তিন বছর কেটে গেছে, কিন্তু কেউ জানে না তারা কবে তাদের নিজের দেশ মিয়ানমার ও শহর রাখাইনে ফিরে যেতে পারবে। যদিও বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে স্বাক্ষরিত দ্বিপক্ষীয় চুক্তি অনুসারে এরই মধ্যে প্রত্যাবাসন শেষ হওয়া উচিত ছিল।

গত দুই বছরে প্রত্যাবাসনের দুটি প্রচেষ্টা হয়েছিল: একটি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে, অপরটি চলতি বছরের ২২ আগস্টে। মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ রোহিঙ্গাদের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া সফল হয়নি, ফলে রোহিঙ্গারা তাদের দেশে ফিরে যেতে আগ্রহী হয়নি। বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের আসল মর্যাদা কি? তারা কি শরণার্থী, নাকি শুধুই আশ্রয়প্রত্যাশী? তাদের অধিকার আসলে কতটা আছে? শরণার্থীদের মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করতে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘ একটি কনভেনশন গ্রহণ করে, যা ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের প্রটোকল হিসাবে সংশোধিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশ ওই কনভেনশনে স্বাক্ষর করেনি। ফলে বিশ্বব্যাপী শরণার্থীদের জন্য যেসব অধিকার বা সুবিধা নিশ্চিত করতে হয়, সেগুলো করার জন্য বাংলাদেশের সরকারের ওপর বাধ্যবাধকতা নেই। তবে সনদে স্বাক্ষর না করলেও ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে যে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে এসেছিলেন, প্রথম দফার তাদের মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার রোহিঙ্গাকে শরণার্থী মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। এই কার্যক্রমে সহায়তা করে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা। এদেরকে কক্সবাজারের দু'টি ক্যাম্পে রাখা হয়। তবে এর কিছুদিন পরেই আরো দুই লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নেন - কিন্তু তাদেরকে আর শরণার্থী মর্যাদা দেয়া হয়নি। সরকারি দু'টি ক্যাম্পের বাইরে আশেপাশে ঘর বানিয়ে তারা বসবাস করতে শুরু করেন।

শরণার্থীদের ব্যাপারে নির্দিষ্ট আইন ও বিধিবিধান জারির আবেদন জানিয়ে ২০১৭

খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হাইকোর্টে নির্দেশনা চেয়ে রিট পিটিশন করেছিলেন একজন আইনজীবী। তবে সেই রিটের এখনো রায় হয়নি। বিহারী জনগোষ্ঠী আর রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ঘটনা ছাড়া বাংলাদেশে শরণার্থী হিসেবে আবেদনের খুব একটা নজির নেই। জাতিসংঘের সহায়তায় একসময় আটকে পড়া পাকিস্তানীদের ক্ষেত্রে শরণার্থী মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে অবশ্য তাদের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের অগাস্টের পর যে প্রায় আট লাখের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসেছে তাদেরকে 'বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক' বলে বর্ণনা করছে সরকার। তাদের শরণার্থী মর্যাদা দেওয়া হয়নি। তবে গণমাধ্যম ও দেশি বিদেশি বেসরকারি সংস্থাগুলো এদের শরণার্থী বলেই বর্ণনা করে থাকে। এছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পাকিস্তানকে সমর্থনকারী যে বিহারি জনগোষ্ঠীর সদস্যদের একসময় 'শরণার্থী' হিসেবে বিবেচনা করা হলেও, পরবর্তীতে তাদের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে।

কারিতাস আয়োজিত নিরাপদ মাতৃত্ববিষয়ক সচেতনতামূলক সেমিনার

কারিতাস বাংলাদেশ

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের একটি শাখা হিসেবে সমাজকল্যাণ, উন্নয়ন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য কাথলিক বিশপ সম্মিলনী কারিতাস সংস্থার প্রতিষ্ঠা করে। অর্থাৎ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবেই এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড়ের পরপরই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাগরকূলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সহায়তায় এবং উন্নয়নকল্পে প্রতিষ্ঠানটি খ্রিস্টিয়ান ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংস্থা (কোর) নামে পুনর্গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জানুয়ারি কার্যক্রমের প্রসারকল্পে জাতীয় সংস্থার রূপ লাভ করে এবং ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুলাই দি সোসাইটিস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৮৬০ অনুযায়ী নিবন্ধন গ্রহণ করে। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে সংস্থাটি নাম পরিবর্তন করে 'কারিতাস বাংলাদেশ' নাম ধারণ করে। ছয়টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য যথাক্রমে- ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের জন্য সামাজিক কল্যাণ, পরিবেশগত সংরক্ষণ ও খাদ্য সুরক্ষা, শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য শিক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, এবং আদিবাসী এবং জনগণের বিকাশ - অর্জনের উদ্দেশ্যে কারিতাস বাংলাদেশ দেশব্যাপী তার আটটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

একটি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে কারিতাস বাংলাদেশ

কারিতাস বাংলাদেশ একটি দেশীয় এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বাধীনতা পরিবর্তী সময় থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ সরকারের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কারিতাস শিক্ষা ও সক্ষমতা বিকাশের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, দরিদ্র জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসেবা, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, পরিবেশ উন্নয়ন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর অগ্রাধিকার প্রদান করে।১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রলয়ংকরী প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার দুর্গত মানুষের সাহায্যার্থে প্রকৃত অর্থে কারিতাস বাংলাদেশে যাত্রা শুরু। তখন থেকে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক অবস্থান এবং দুর্গত মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে প্রথমে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাংলাদেশে কারিতাস বিপুল পরিমান ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। সে সকল কার্যক্রমে সাক্ষ্য এখনো চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মনপুরা ও নোয়াখালীর বয়স্ক মানুষদের কাছ থেকে শুনতে পাওয়া যায়। কারিতাস বাংলাদেশ তার নিজস্ব বিমান ও স্পিড বোটে করে খাদ্য নিয়ে পৌছেছিল ক্ষতিগ্রস্ত সর্বস্তরের মানুষের কাছে। অন্যদিকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলে অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। অর্থনীতি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আর্থ-সামাজিক কাঠামো বদলে যায়। সমাজ জীবনে দেখা দেয় ব্যাপক দারিদ্র্যের প্রকোপ। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটির পুনর্বাসনের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিলে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নিয়ে এগিয়ে আসে কারিতাস বাংলাদেশ। ঐ সময় সরকারের পাশাপাশি ব্র্যাক, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, কারিতাস বাংলাদেশ, ক্রিশ্চিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। পর্যায়ক্রমে চট্টগ্রাম থেকে কারিতাসের কর্মপরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে। ত্রাণ ও পূর্ণবাসন কাজ থেকে শুরু করে দারিদ্র বিমোচন, পল্লী উন্নয়ন, জেণ্ডার সমতা বিধান, পরিবেশ রক্ষা, সামাজিক বনায়ন, দল গঠন, ক্ষুদ্রঋণ, শিশুস্বাস্থ্য, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, দক্ষতা ও উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রভৃতি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মনোনিবেস করে কারিতাস। সম্পদের উপর দরিদ্রতর জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করতে এবং

বাংলাদেশের দরিদ্রতম মানুষের প্রাপ্তিযোগ্য সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নেও তাদের অধিকার কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করতে পরবর্তীতে শুরু করে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম।

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী ও কারিতাস বাংলাদেশ

বাংলাদেশ খ্রিস্ট মণ্ডলী পার করেছে বিশ্বাসের তীর্থ যাত্রার ৫০০ বছর। শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সেই পূর্ব পাকিস্তান আমল থেকেই ক্যাথলিক মণ্ডলীর অবদান সর্বজন স্বীকৃত। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে ধর্মীয় কাজের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেন। ধর্মীয় এবং মাণ্ডলীক কার্যযজ্ঞ পাশাপাশি উন্নয়নের বিশাল কর্মযোগ্য পরিচালনার জটিলতা লাঘবে তাই পৃথক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সামনে আসে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ক্যাথলিক মণ্ডলীর একটি সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে কারিতাস বাংলাদেশের জন্ম হয়। কাথলিক মণ্ডলীর একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা ও দিকনির্দেশনায় পরিচালিত হয়। কাথলিক মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিটি ধর্মপ্রদেশের সঙ্গেই রয়েছে কারিতাসের পৃথক পৃথক আঞ্চলিক কার্যালয়। কাথলিক যার বুৎপত্তিগত অর্থ সর্বজনীন তাই ক্যাথলিক মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠান কারিতাসের সেবা কাজ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য নিবেদিত। সাধারণ সভা ও একটি নির্বাহী পরিষদ দ্বারা কারিতাসের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর নেতৃস্থানীয় ৩১ জন প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত সাধারণ সভা কারিতাসের নীতি নির্ধারণ করে, বার্ষিক বাজেট ও অডিট প্রতিবেদন অনুমোদন করে, অডিটর নিয়োগ করে এবং নির্বাহী পরিষদ গঠন করে। কারিতাস বাংলাদেশের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মূল্যবোধ, দর্শন, অনুপ্রেরণা এবং বাধ্যবাধকতা সম্পূর্ণ খ্রিস্ট ধর্মের সামাজিক শিক্ষার আলোকে রচিত এবং বাংলাদেশ ক্যাথলিক মণ্ডলীর ধর্মগুরুদের দ্বারা স্বীকৃত। সুতরাং বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী এবং কারিতাস বাংলাদেশ পৃথক নয় বরং সামাজিক উন্নয়নের একটি সংস্থা মাত্র।

অভিবাসী ও কারিতাস বাংলাদেশ

অভিবাসন একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্তর্নিহিত প্রভাব ফেলে। তাই এটি হওয়া চাই নিরাপদ এবং অভিবাসীর স্বার্থ রক্ষায়। প্রতি বছর ২.০ মিলিয়ন যুবক চাকরির বাজারে প্রবেশ উপযোগী হচ্ছে অথচ যেখানে কর্মসংস্থান খুব ধীর গতি সম্পন্ন। গত এক দশক ধরে বাংলাদেশের স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (গড় ৬% জিডিপি) সত্ত্বেও এটি দেশের দক্ষ, আধা দক্ষ এবং অদক্ষ কর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান তৈরি করতে সক্ষম নয়। এই পরিস্থিতিতে দেশে দারিদ্র্য, বেকারত্ব কিংবা আংশিক বেকারত্ব থেকে রক্ষা পেতে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী শ্রমিক বিদেশে চাকরির সন্ধান করছে। বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর ৫ লক্ষাধিক লোক চাকরির জন্য বিদেশ যাত্রা করে। অভিবাসন বাংলাদেশের জনগণের জীবিকার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল বা উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে বিদেশের চাকরির জন্য বেশিরভাগ শ্রমিক আধা দক্ষ বা অনুপযুক্ত। এই ধরনের অভিবাসীদের অনেকেই প্রতারণা ও হয়রানির শিকার হয় যা অভিবাসন চক্রের প্রতিটি পর্যায়ে শোষণের শিকার। পূর্ব প্রস্তুতির জন্য তাদের সঠিক ধারণার ঘাটতি রয়েছে। অনিরাপদ অভিবাসন বন্ধ ও মানবপাচার প্রতিরোধে কারিতাস বাংলাদেশ দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিদেশে অবস্থানরত বাঙালীদের আত্মীয়স্বজনদের উন্নয়ন, অভিবাসন প্রত্যাশীদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পাশাপাশি বিদেশে অবস্থানরত অবৈধ অভিবাসীদের এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত অবৈধ বিদেশী নাগরিকদের কল্যাণার্থে কাজ করছে কারিতাস বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ঢাকা এবং চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশে পাড়ি জমায়। অভিবাসী এসকল বাংলাদেশী পরিবার বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। এছাড়াও বিদেশগমনে রয়েছে পাচার এবং বিভিন্ন প্রতারণার ফাঁদ। তাই বিভিন্নভাবে প্রতারণার শিকার এসকল অভিবাসী পরিবারের কল্যাণার্থে কারিতাস দীর্ঘদিন বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইউনিয়নভিত্তিক অভিবাসন কমিটি গঠন; ইউনিয়ন ইয়ুথ ফোরামের উদ্যোগে সভা, ক্যাম্পেইন, র‌্যালি ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা; অভিবাসী পরিবারের রেমিটেন্স ব্যবস্থাপনা; স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে স্পাউস সভায় সচেতনতামূলক সেশন পরিচালনা করা; পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে অভিবাসী দম্পতি সদস্যদের আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং বিদেশ গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক পূর্ব প্রস্তুতিমূলক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা এই প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম। এছাড়াও প্রকল্প পরিচালিত "অভিবাসী তথ্য ও সেবা কেন্দ্র"র মাধ্যমে অভিবাসন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদানসহ সরকারি-বেসরকারি সুযোগ-সুবিধা আদায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকেজ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কারিতাস অভিবাসীদের জন্য পরিচালিত এই প্রকল্পের মাধ্যমে অনিরাপদ অভিবাসন এড়াতে ইউনিয়ন অভিবাসন কমিটির মাধ্যমে ১,৩৫১ জন সম্ভাব্য বিদেশগামী কর্মীকে সহায়তা দিয়েছে। এপর্যন্ত মোট ১,৯৯,৯৪৮ জন প্রকল্পের অনিরাপদ অভিবাসন সম্পর্কে সচেতনতামূলক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছে। এপর্যন্ত ৮,৬৫৭জন বিদেশগমনেচ্ছু কর্মী অভিবাসী তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য এবং রেফারেল পরিষেবা পেয়েছে। অভিবাসী তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে ৫২৪টি ভিসা অনলাইনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চুক্তিপত্র যাচাই করা হয়েছে। ৮৯ জনকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্রের ঠিকানা প্রদান এবং ১৮৫টি পাসপোর্ট ফরম পূরণ করা হয়েছে। দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সম্ভাব্য বিদেশগামী ২৯২ জনকে ঠিকানা প্রদানসহ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়েছে। বিএমইটি ডাটা বেইজ এ রেজিস্ট্রেশনের জন্য ১৩৪ জনকে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসে প্রেরণ, অভিবাসন ঋণের জন্য ৬৪৬জনকে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিরাপদ অভিবাসন সংক্রান্ত (ভিসা চেকিং/স্বাস্থ্য পরীক্ষা) জন্য বিদেশগমনেচ্ছু ৬ জন (মহিলা) কর্মী অভিবাসী তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের সহায়তা নিয়েছেন। ইউনিয়ন অভিবাসন কমিটি বিদেশ গমনেচ্ছু ১২জন (মহিলা) কর্মীকে অনিরাপদ অভিবাসন পরিত্যাগ করতে সহায়তা করেছেন। সম্ভাব্য অভিবাসী ১৬ জন কর্মীকে শ্রম অভিবাসনের নামে মানবপাচার বা অনিরাপদ অভিবাসন থেকে রক্ষা করেছেন। অভিবাসী দম্পতি সদস্যগণ রেমিট্যান্স ব্যবহারের সর্বোত্তম উপায় সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। ফলে পারিবারিক আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হয়েছেন। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এর উপকারিতা সম্পর্কে অবগত হওয়ায় তারা

নিজ নামে ব্যাংক হিসাব চালু করেছেন। হুন্ডির মাধ্যমে রেমিটেন্স গ্রহণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। দলীয় সভায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিগত এক বছরে মোট ৩৬১ জন অভিবাসী দম্পতি সদস্য ব্যাংক হিসাব চালু করেছে। ফলে তারা ব্যাংকে ডিপোজিট বা সঞ্চয় জমা শুরু করেছেন। বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরা দালালের সহায়তা ছাড়া পাসপোর্ট তৈরি, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইত্যাদি নিজেরাই করতে শুরু করেছে। দক্ষতাবৃদ্ধি প্রশিক্ষণ নিয়ে বিদেশ যাওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং, প্রকল্পটি কর্ম এলাকায় অনিরাপদ অভিবাসন, প্রতারণা এবং জালিয়াতির হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করছে। অপরদিকে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে প্রকল্পের সচেতনতামূলক কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিক ও কারিতাস বাংলাদেশ

বিভিন্নভাবে নির্যাতনের স্বীকার হয়ে মায়ানমার থেকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বেশ কয়েকবার বাংলাদেশে আশ্রয়লাভের উদ্দেশ্যে এসেছে। রোহিঙ্গাদের এই আশ্রয়গ্রহণের ইতিহাস শতাব্দির। বিভিন্ন সময়ে ছোট পরিসরে এই আসা-যাওয়া চললেও ইতিহাস থেকে ৫টি বড় ধরনের ঘটনার কথা জানা যায় ১৭৮০, ১৯৪০,১৯৭৮, ১৯৯১-৯২, এবং ২০১৬-১৭ খ্রিস্টাব্দ যখন বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা প্রাণভয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছিল। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব বাতিল হয়ে যাবার রেস ধরে চলতে থাকা অরাজকতার প্রেক্ষিতে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ আড়াই লক্ষাধিক রোহিঙ্গার একটি বড় জনস্রোতের আশ্রয় দেয়। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে আগত সকল রোহিঙ্গা ফিরে গেলেও ১৯৯১ সালে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের বড় একটি সংখ্যা বাংলাদেশেই দুইটি স্থায়ী ক্যাম্পে থেকে যায়। ১৯৯১-৯২ খ্রিস্টাব্দে আশ্রয় নেওয়া ঐ সকল রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিয়ে শুরু হয় কারিতাস বাংলাদেশের শরাণার্থীদের সাথে প্রথম কার্যক্রম। সে সময় রোহিঙ্গাদের জন্য আশ্রয়ন এবং খাদ্য বিতরণ কাজে লিপ্ত ছিল কারিতাস বাংলাদেশ। সর্বশেষ রোহিঙ্গাদের বড় দলটি প্রবেশ করে ২৫ আগষ্ট ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে।

ইউএনএইচসিআর-এর সর্বশেষ তথ্য মতে বর্তমানে পুরাতন এবং নতুন মিলিয়ে ৩৪টি ক্যাম্পে প্রায় ১৫১,০২৭ পরিবার/৮৬১,৫৪৫ জন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষ রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ২৫ আগস্ট কক্সবাজার সীমান্ত খুলে দেওয়া হলে কাতারে কাতারে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে প্রবেশ করে। প্রথম দিকে তারা বিভিন্ন রাস্তার পার্শ্বে আশ্রয় গ্রহণ করে। স্থানীয় জনগণ এসকল রোহিঙ্গাদের সহায়তায় সর্বপ্রথম এগিয়ে আসে। ২৯ আগস্ট কারিতাস বাংলাদেশের পক্ষে চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে দুই সদস্য বিশিষ্ট প্রথম দল মাজাহারুল ইসলাম (প্রোগ্রাম অফিসার-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা) এবং আবু তাহের (জুনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা) রোহিঙ্গাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণে আসেন। অতপর ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ প্রথম দলের প্রেরিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং সাড়াদানের নিমিত্তে কারিতাস বাংলাদেশ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনার পক্ষে দ্বিতীয় দল হিসেবে রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিও (পরিচালক-প্রোগ্রামস্) এবং জেমস গোমেজ (আঞ্চলিক পরিচালক-কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চল) কক্সবাজার পরিদর্শন করেন। প্রকৃত পক্ষে ঐদিন থেকেই রোহিঙ্গাদের জন্য জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমে কারিতাস বাংলাদেশের কার্যক্রম শুরু হয়। কার্যক্রম শুরুর দিন থেকেই বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর নেতৃস্থানীয় পর্যায়ের এবং কারিতাস বাংলাদেশ-এর পরিচালনামণ্ডলীর নির্দেশনা ছিল সুনির্দিষ্ট। ক্যাথলিক মণ্ডলীর নেতৃস্থানীয় পর্যায় থেকে সর্বপ্রথম কক্সবাজার পরিদর্শণে আসেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের তৎকালীন আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি। কক্সবাজার পরিদর্শনকালে বিভিন্ন পর্যায়ে তার বলিষ্ঠ ভূমিকা এবং মিডিয়ায় তার জোরালো আবেদন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের কাথলিক সেবা সংস্থাকে রোহিঙ্গাদের সেবাকাজে এগিয়ে আসার খোরাক জুগিয়েছিল। রোহিঙ্গাদের জন্য পরিচালিত সেবা কার্যক্রমের সূচনালগ্নে কারিতাস বাংলাদেশ-এর প্রেসিডেন্ট বিশপ জের্ভাস রোজারিও এবং তৎকালীন চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল প্রয়াত মজেস কস্তা সিএসসি'র অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশপগণ সার্বক্ষণিকভাবে কক্সবাজারে উপস্থিত থেকে কারিতাস বাংলাদেশ-এর কর্মীদের বিভিন্নভাবে সাহস জুগিয়েছেন এবং দিকনির্দেশনা দিয়ে কার্যক্রমকে বেগবান করেছেন। পর্যায়ক্রমিকভাবে বাংলাদেশের বিশপগণ রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করে বিশ্বের বিভিন্ন মহলে তুলে ধরেছেন মানবিক আবেদন।

রোহিঙ্গাদের মাঝে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি

গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ রোহিঙ্গা কার্যক্রমে কারিতাস বাংলাদেশ-এর যুক্ত হওয়ার তিন বছর পূর্ণ হলো। পবিত্র বাইবেলের অষ্টকল্যাণ বানীতে উল্লেখিত "আমি নিরাশ্রয় ছিলাম আর তুমি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে; ছিলাম ভিনদেশী আর তুমি আমাকে স্বাগত জানিয়েছিলে" - অনুপ্রাণিত হয়ে কারিতাস কর্মীরা খ্রিস্টের ভালবাসাপূর্ণ সেবা পৌঁছে দিয়েছে অগনিত ভিনদেশী রোহিঙ্গা ভাই-বোনদের মাঝে।

রোহিঙ্গাদের মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসন এবং তাদের অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ কাথলিক

মণ্ডলীর সঙ্গে একত্রিত হয়ে ফেডারেশন অব এশিয়ান বিশপ কনফারেন্স এবং খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগুরু পূণ্যপিতা পোপ মহোদয়ও সোচ্চার হয়েছেন এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মাধ্যমে বক্তব্য রেখেছেন। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর বাংলাদেশ সফরকালে রোহিঙ্গাদের সাথে সাক্ষাৎ করে পোপ মহোদয়ের উক্তি "বর্তমান সময়ে খ্রিস্টের উপস্থিতি হলো রোহিঙ্গা" - সমগ্র মিডিয়ায় আলোড়ণ তৈরি করেছিল।

প্রতিটি শরণার্থী পরিস্থিতির সঙ্গে, যেখানেই হোক না কেন, যতোদিন ধরেই চলুক না কেন, সেখানে সমাধানের ওপর জোর দেওয়া অব্যাহত রাখা উচিৎ। তাদের আপন গৃহে ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে যেসব বাধা রয়েছে সেগুলো নির্মূল করতে সকলেরই উচিৎ নিজ নিজ পর্যায় থেকে অবদান রাখা। বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা যারা নিজের দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল তাদের নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার এবং জনগণের উদারতার পাশাপাশি অন্য সকল ধনী দেশেরই এগিয়ে আসা উচিৎ।

বিগত তিন বছরে কারিতাস বাংলাদেশ সামগ্রিক রোহিঙ্গা সাড়াদান কর্মসূচীতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। কারিতাস বাংলাদেশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বর্তমানে কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলায় মোট ৩৪টি রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মধ্যে ১১টি ক্যাম্পে কারিতাস বাংলাদেশ খ্রিস্ট মণ্ডলীর পক্ষে সেবা দান করে চলেছে। খাদ্য, বাসস্থান, পারিপার্শ্বিক এলাকার উন্নয়ন, ওয়াস, সুরক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষা খাতে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে গত তিন বছরে কারিতাস বিভিন্ন সেবা ও সহযোগিতা পৌঁছে দিয়েছে প্রায় ১৪৬,৮১৯ জন রোহিঙ্গা ভাইবোনদের কাছে (একক গণনা)। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর মাসে বিশ্ব খাদ্য সংস্থা ও কারিতাস ইন্টারন্যাশনালিজের সহায়তায় শুধুমাত্র রান্না করা খাবার সরবরাহ করা হয়েছিল ১০৪,৯৮০ রোহিঙ্গাকে।

রোহিঙ্গাদের জন্য জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমে কারিতাসের সবচেয়ে বড় অবদান আশ্রয়ন/আবাসন ক্ষেত্রে। বাংলাদেশ সরকারের শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের পরিচালনায় আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থার সঙ্গে কারিতাস রোহিঙ্গাদের জন্য পরিচালিত সমগ্র জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমের সহ-সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করছে। এই সুবাধে কারিতাস বিভিন্ন সময়ে রোহিঙ্গাদের জন্য উন্নতমানের এবং স্থয়িত্বশীল গৃহ নির্মাণে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পের স্থায়িত্বশীল গৃহ নির্মাণের ডিজাইন কারিতাস বাংলাদেশেরই করা যা বর্তমানে ক্যাম্পে নিযুক্ত অন্য সকল সংস্থা বাস্তবায়ন করছে। গত তিন বছরে কারিতাস বাংলাদেশ সরাসরি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ২২,৪১৮ টি পরিবারের গৃহ নির্মাণ করে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান করেছে।

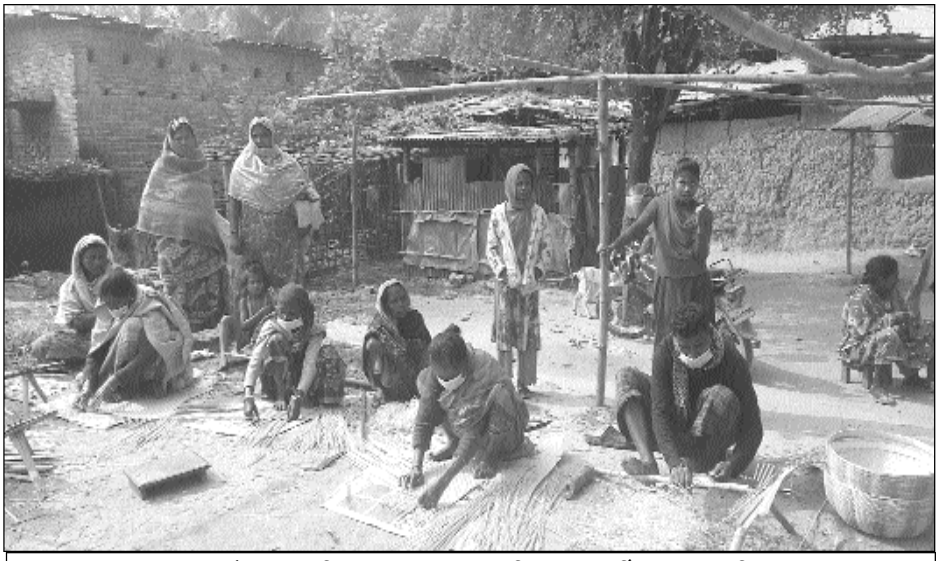

পারিপার্শ্বিক এলাকার উন্নয়ন ক্ষেত্রেও কারিতাসের অবদান উল্লেখযোগ্য। কারিতাস ক্যাম্প ৪, ১৩ এবং ১৯ এর আবাসন ফোকালের দায়িত্ব পালন করছে। কারিতাসের উদ্ভাবিত বাঁশের ড্রেন ও সাঁকো এবং অন্যান্য কার্যক্রম সমগ্র ক্যাম্পের মডেল বলা যেতে পারে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রায় ৬,২০০ একরের বেশি পাহাড়ি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে তৈরি করা হয় রোহিঙ্গাদের আবাসন ব্যবস্থার জন্য। এবিশাল জনগোষ্ঠীর রান্নাবান্নার জন্য প্রয়োজনীয় কাঠের তাগিদে দিনের পর দিন উজাড় হয় পাহাড়ি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের অগণিত গাছপালা। পরিবেশের এই বিপুল ধ্বংসরোধে কারিতাস বাংলাদেশ সর্বপ্রথম তরল গ্যাসের সিলিণ্ডার বিতরণ করে। প্রায় ৪৮,০০০ পরিবারকে একাধারে পাঁচ মাস যাবৎ গ্যাস সিলিণ্ডার বিতরণের পর এর সুফল অন্যান্য সকলের কাছে সমাদৃত হয়। ফলস্বরূপ পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সংস্থাও একাজে নিযুক্ত হয় এবং বর্তমানে প্রায় সকল রোহিঙ্গা পরিবারই কাঠের চুলার পরিবর্তে গ্যাসের চুলায় রান্নার সুযোগ পেয়েছে। অনুরূপভাবে বিপুল পরিমাণ গাছ কেটে ফেলার ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের যে ক্ষতিসাধন হয়েছে তা কিছুটা পরিমানে লাঘবের জন্য কারিতাস ক্যাম্প অভ্যন্তরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী শুরু করে যা পরবর্তী সময়ে অন্যান্য সংস্থা অনুসরণ করেছে। পাহাড়ি বনাঞ্চল হওয়ায় এ অঞ্চলের কোথাও ইলেকট্রিসিটির সুবিধা ছিল না। রাতে বন্য হাতির তাণ্ডব, মহিলাদের নিরাপত্তা এবং অন্যান্য বিষয় বিবেচনায় কারিতাস ক্যাম্পে স্থাপন করে সোলার লাইট। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে কারিতাসের কার্যক্রম পরিচালিত ক্যাম্পের রোহিঙ্গাদের ঠিকানা জানতে চাইলে বা কারিতাসের ক্যাম্প কোনটি কেউ প্রশ্ন করলে সকলে একবাক্যে উত্তর দিত রাতে যে ক্যাম্পে লাইট জ্বলে আমরা সেখানে থাকি বা ঐটা কারিতাসের ক্যাম্প। এই কার্যক্রমটিতে ধীরে ধীরে পরবর্তীকালে অন্যান্য অনেক সংস্থা যুক্ত হয়। বর্তমানে প্রায় ৯০% ক্যাম্পেরই সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কক্সবাজারের বিভিন্ন স্থানে বর্তমানে কারিতাসের ১২৭৯টি সোলার স্ট্রিট লাইট আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও শিক্ষা, নারী-শিশু-মহিলাদের সুরক্ষা এবং ওয়াস সেক্টরে কারিতাস বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির পাশে কারিতাস

বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও কারিতাস বাংলাদেশ

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ। সমাজসেবা অধিদফতরের জরিপমতে বাংলাদেশে প্রায় ১০,২০,১২৫ জন অনগ্রসর জনগোষ্ঠী রয়েছে। কামার, কুমার, নাপিত, বাঁশ ও বেত প্রস্তুতকারক, কাঁশা/পিতল প্রস্তুতকারী, নকশী কাঁথা প্রস্তুতকারী, জুতা মেরামত/প্রস্তুতকারী, লোক শিল্প ইত্যাদি তথাকথিত নিম্নবর্ণের জনগোষ্ঠী এ প্রান্তিক সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রযুক্তির সংস্পর্শে এনে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ সকল জনগোষ্ঠীর পেশাকে আধুনিকায়ন করে বেকারত্ব দূর করা যায়। প্রযুক্তিগত পেশায় প্রশিক্ষিত করে কর্মসংস্থানে অন্তর্ভূক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করছে কারিতাস বাংলাদেশ। বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ছয়টি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা মোকাবিলায় কারিতাস বাংলাদেশ বর্তমানে ৮৭টি উন্নয়ন প্রকল্প, ৩টি ট্রাস্ট বাস্তবায়ন করছে এবং এসকল প্রকল্প পরিচালনায় বিগত অর্থবছরে ২০,৫৪,৩৭৫ জন প্রোগ্রাম অংশগ্রহণকারী জীবনমানসহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য কাজ করেছে। কারিতাস বর্তমানে ৩,৫৯৪ জন কর্মী ও ১,৬৫১ জন স্বেচ্ছাকর্মী নিয়ে ৪৯টি জেলার ১৮৯টি উপজেলায় সমন্বিত উন্নয়ন, সমাজ কল্যাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজ করছে।

মাথাপিছু আয় দিনে ১.২৫ মার্কিন ডলারের বেশি; পরিবেশ-বান্ধব নিজস্ব বাড়ি; সামাজিক সুরক্ষা, মানবাধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা; প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সামাজিক কল্যাণ; প্রতিবন্ধী, পথশিশু, তৃতীয় লিঙ্গ, দলিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়, শহুরে দরিদ্র, প্রান্তিক, ঝুঁকিপূর্ণ সম্প্রদায় ও বস্তিবাসিদের জীবনমানের উন্নতি; বিউটি পার্লার শ্রমিক, গার্মেন্টস শ্রমিক, গৃহকর্মী, যৌনকর্মী, পথশিশুদের নিরাপত্তা ও জীবনমান উন্নয়নের উদ্দেশে কারিতাস বাংলাদেশ বর্তমানে ১৭টি প্রকল্পের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে চলেছে।

টেকসই কৃষি অনুশীলন; টেকসই পশুপালন ও হাঁস-মুরগির লালন পালন অনুশীলন; টেকসই জলজ অনুশীলন; নিরাপদ, পুষ্টিকর এবং বিবিধ খাবারের জন্য চরম দরিদ্র, দরিদ্র এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের প্রবেশকে শক্তিশালীকরণ; প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ শক্তিশালীকরণ; অর্থনৈতিক বিকাশ এবং দারিদ্র্য নিরসনের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদগুলির অনুকূল ও টেকসই ব্যবহার; বাস্তুসংস্থান, প্রজাতি এবং জিনগত বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য শক্তিশালী প্রক্রিয়া; এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়াগুলিতে সকল সম্প্রদায়ের একীকরণ জোরদারকরণের উদ্দেশে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-দুইয়ের অধীনে কারিতাস বর্তমানে ১১টি প্রকল্প পরিচালনা করছে। এ সকল প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের উপকূলীয় অঞ্চল, পাহাড়ি অঞ্চল এবং সমতলের প্রায় ১২১,৬২৭ জন প্রান্তিক মানুষ তাদের জীবনমান পরিবর্তনের সুযোগ পেয়েছে।

সবচেয়ে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক শৈশব বিকাশ/প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ তৈরি; দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়ের সন্তানদের মানসম্পন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ তৈরি; দরিদ্র (যুবক এবং প্রাপ্তবয়স্ক) এবং সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের ভোকেশনাল এবং টেকনিক্যাল শিক্ষার সুযোগ তৈরি; শিশু, যুবক এবং প্রাপ্তবয়স্কদের শারীরিক, মানসিক এবং যৌন নির্যাতন এবং অন্যান্য ঝুঁকি (পাচার, ইভটিজিং ইত্যাদি) থেকে সুরক্ষিত করা; শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং সংহত পদ্ধতিতে শিশুদের সামগ্রিক বিকাশ (শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, নান্দনিক, আধ্যাত্মিক বিকাশ ইত্যাদি) প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় কারিতাস বাংলাদেশের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-তিন। এই সেক্টরের মাধ্যমে বর্তমানে কারিতাস ৬১৫টি প্রকল্পের মধ্যদিয়ে গুণগত শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করে স্বাবলম্বি হওয়ার পথে সহায়তা করতে পেরেছে ১,৮৩৫ জনকে। কারিতাস বাংলাদেশের ৫৩৮টি বিদ্যালয়ের মাধ্যমে মোট ২২,৩৮৬ জন শিক্ষার্থী (বালক ১১,২৮৫ এবং বালিকা ১১,১০১) শিক্ষা গ্রহণ করছে -এর মধ্যে ৮০৬ জন আদিবাসী সম্প্রদায়ের। গত এক বছরে মোট ১,৮৩৫ জন যুবক (ছেলে ৯৫৪ এবং মেয়ে ৮৮১) কারিতাসের কারিগরি শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে এবং মোট ১,৮৩৫ জন বিভিন্ন বৃত্তিমূলক এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষা অর্জন করেছেন।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা জোরদার করা; প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনা জোরদার করা; স্যানিটেশন এবং হাইজিন- এর গুণগত মান এবং ন্যায্য প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ; যৌন সংক্রমণ (এসটিআই), এইচআইভি এবং এইডস, টিবি, কুষ্ঠ এবং অন্যান্য সংক্রামক রোগগুলি প্রতিরোধে সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন; মাদকসেবীদের এবং যৌন নির্যাতনের জন্য প্রতিরোধ, চিকিৎসা এবং যত্নের পরিষেবাগুলি জোরদার করা; এবং পুষ্টির প্রাপ্যতা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কারিতাস বাংলাদেশ পরিচালনা করছে তার লক্ষ্য নম্বর চার "পুষ্টি ও স্বাস্থ্যশিক্ষা"। এই সেক্টরের মাধ্যমে গত এক বছরে কারিতাস বাংলাদেশ ২৯৯,২৫২ জনের পুষ্টি, স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং শিক্ষা নিশ্চিত করেছে।

বারাকাতে পথশিশুদের চিকিৎসা

দুর্যোগকালীন সময়ে জরুরি প্রতিক্রিয়া টেকসইকরণ; দুর্যোগে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রাথমিক প্রয়োজন মর্যাদার সাথে পূরণ;

দুর্যোগ মোকাবেলায় সম্প্রদায়কে শক্তিশালীকরণ; জরুরি প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা, কৌশল ও নীতিসমূহে বিপর্যয় ঝুঁকি হ্রাস মূলধারায় সংযুক্তকরণ; দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন থেকে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণ; এবং নগর জীবনে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দুর্যোগ ঝুঁকির স্থিতিস্থাপকতা ও টেকসইকরণের উদ্দেশ্যে কারিতাস বাংলাদেশ পরিচালনা করছে প্রতিষ্ঠানের পঞ্চম লক্ষ্য "দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা"। এই সেক্টরের মাধ্যমে কারিতাস বাংলাদেশের সেবা ও সহায়তা দেশের উপকূলীয় অঞ্চলসহ যে কোন প্রান্তে যে কোনো ধরনের দুর্যোগে দ্রুততম সময়ে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। বিগত এক বছরে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত '২৪১,১১০ জন মানুষকে তাৎক্ষণিক নগদ অর্থসহ ত্রাণ সহায়তা ও স্বাভাবিক জীবনে পুনরায় ঘুরে দাঁড়াতে এই সেক্টরের মাধ্যমে কারিতাসের সেবা ও সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। কারিতাস প্রাকৃতিক দুর্যোগে আর্থিক ও বস্তুগত সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। কারিতাস অদ্যাবধি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রায় ২৪৬টি সাইক্লোন সেন্টার তৈরি করেছে পাশাপাশি দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য প্রায় ৪,৪৬,৬৭০টি স্বল্প মূল্যের গৃহ নির্মাণ করেছে। গত বছর ৩৯০টি পরিবারকে পেশাগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং ৫৪০ জনকে কাজের বিনিময়ে অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

আদিবাসী মানুষদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন; ঐতিহ্যবাহী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং আদিবাসীদের নেতৃত্বাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ; এবং আদিবাসীদের সামগ্রিক সক্ষমতা জোরদারকরণের লক্ষ্যে পরিচালিত হয় প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছয়। উক্ত সেক্টরের অধীনে বিগত এক বছরে সিলেট, ময়মনসিংহ, পার্বত্যাঞ্চল, ও রাজশাহী বিভাগে বসবাসরত বিভিন্ন আদিবাসী/নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর প্রায় ৯৫,৩৬৮ জনের অধিকার ও জীবনমান উন্নয়নে অবদান রাখতে পেরেছে কারিতাস বাংলাদেশ।

উপসংহার

কারিতাস বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর থেকেই ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মানবিক চেতনা বোধ থেকেই মানবসেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে। তৎকালীন সময়ে এসব সেবামূলক ব্যবস্থা ছিল অপর্যাপ্ত, অসংগঠিত ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে। পরবর্তীতে আধুনিক সমাজে জটিল সমস্যা সমাধানে ও সময়ের পরিসরে তা সুসংগঠিত উপায়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় এবং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রলয়ংকরী প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার দুর্গত মানুষের সেবা থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বাংলাদেশ মণ্ডলীর পক্ষে কারিতাস বাংলাদেশ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম মানুষের কাছে খ্রিস্টের ভালবাসা পৌঁছে দিচ্ছে। দরিদ্রদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা ও দারিদ্র মোকাবেলায় চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করায় এর গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে॥

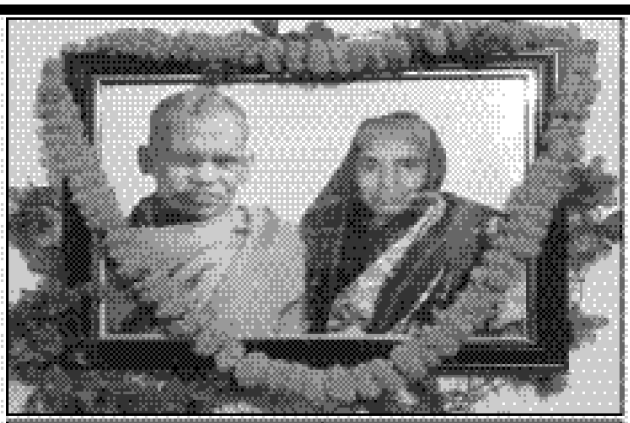

জেরম ডি'কস্তা
জন্ম: ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ০৮ এপ্রিল ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

ডমিনিকা কস্তা
জন্ম: ১৭ নভেম্বর ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১১ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

মমতাময়ী মায়ের স্বর্গযাত্রা
"মরণ সাগরপারে তোমরা অমর, তোমাদের স্মরি"

আজ ১১ নভেম্বর বেলা ৩টায় সকল দুঃখ-কষ্টকে হাসিমুখে গ্রহণ করে মা তুমি তোমার সন্তানদের কোলে মাথা রেখে যাত্রা করেছ পরম পিতার আশ্রয়ে। নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে সত্য করে দিয়ে মা তুমি চলে গেলে অমৃতলোকে। তুমি ছিলে সদা পরিশ্রমী, পরোপকারী, আধ্যাত্মিক, কষ্টসহিষ্ণু ও পরম স্নেহময়ী মা। জীবনের অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে সংসারের সুখ-আনন্দ-কষ্টকে গ্রহণ করেছো অবিচল চিত্তে। ছিল না তোমার কোনো অভিযোগ। সর্বদা নিঃস্বার্থভাবে ভেবেছো আমাদের কল্যাণ। আজ তোমাকে হারিয়ে আমরা নিঃস্ব। কিন্তু সান্ত্বনা এই যে তুমি তোমার স্নেহমাখা হাতখানা দিয়ে সদাসর্বদা আমাদের উপর স্বর্গীয় আশিসধারা বর্ষণ করে যাচ্ছ। তোমার জীবন দৃষ্টান্ত আমাদের সাহস ও চলার পথের পাথেয়।

তোমার স্নেহভাজন সন্তানেরা

রেখা থিওফিলা কস্তা, রবি ফ্রান্সিস কস্তা, হেলো মার্টিনা কস্তা, রঞ্জন হিউবার্ট কস্তা, রিপন জেমস কস্তা; নাতি-নাতনিরা: অনিমা জেনেভিভ গ্রেগ, লিজা কস্তা, লিবার্টি কস্তা, হেমা মন্ডল, হিমানী মন্ডল, আলো কস্তা, রুদ্র কস্তা, রাজর্ষি কস্তা, অনুশ্রী কস্তা, রেইনি কস্তা
পুতি: এলভিহন রোজারিও।
মেয়ে জামাই: মথি মন্ডল
ছেলে বউ: লিলিয়ান রিবেকা, সাথি কস্তা, ছবি ইউজিনা গনছালভেস
রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী
ছোট সাতানী পাড়া
কালীগঞ্জ, গাজীপুর

বড়দিন : বাংলার ঘরে-ঘরে সঙ্গীত ও সুরে

ফাদার সুনীল ডানিয়েল রোজারিও

খ্রিস্টযিশুর জন্মদিন ঘিরেই আজকের বড়দিন উৎসব। বড়দিন এখন একটি সর্বজনীন উৎসব। সেকালের বড়দিন উৎসব কিন্তু আজকের মতো এতো বিনোদননির্ভর ছিলো না। নানা বিধি-নিষেধ, জাতিগত সংস্কৃতির মিশ্রণ, পারিবারিক উৎসব থেকে আজকের বড়দিন। কাথলিকদের বিরুদ্ধে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনকারীরা খ্রিস্টমাসকে পৌত্তলিকদের উৎসব আখ্যা দিয়ে উৎসব বর্জন করেছিলেন। তখন ছিলো না খ্রিস্টমাস ট্রি, গিফট আদান-প্রদান, সান্তা ক্লজ, ডেকোরেশন, খানা-পিনা বা বাণিজ্যকরণ। বড়দিনের গান-বাজনা ছিলো সীমিত আকারে। পশ্চিমের দেশগুলোতে ইংল্যাণ্ড থেকে ধার করা কিছু গান প্রচলিত ছিলো। আজকে আমরা যে Christmas Carols বলি, এগুলো এসেছে ইউরোপ থেকে। ক্যারল শব্দের অর্থ নৃত্য ও আনন্দ। শীতকালে, সম্ভবত ২২ ডিসেম্বর বিধর্মী দেব-দেবী পূজকরা পাথরের চারিদিকে গোলাকারভাবে ঘুরে-ঘুরে নৃত্য-গান করতো, যেটাকে বলা হতো ক্যারল। সেই সময় ক্যারলের অনেক ধারণা প্রচলিত থাকলেও- আজকে আর নেই। শুধু বেঁচে আছে খ্রিস্টমাস ক্যারল।

রোমান কাথলিকদের খ্রিস্টমাস উদ্‌যাপনের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ১২৯ খ্রিস্টাব্দে রোম নগরের বিশপ টেলেস্ফোরিউস, বড়দিনকালে বিধর্মীদের গান গাইতে বারণ ক'রে "দূতসংবাদের গান" গাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই দূতসংবাদের গানটি সাধু লুক রচিত মঙ্গলসমাচারে এইভাবে বর্ণিত আছে, 'তখন হটাৎ সেই দূতের পাশে দেখা দিল স্বর্গের এক বিরাট দূতবাহিনী। তাঁরা পরমেশ্বরের বন্দনা করে বলে উঠলেন,' "জয় ঊর্ধ্বলোকে পরমেশ্বরের জয়, ইহলোকে নামুক শান্তি তাঁর অনুগৃহীত মানবের অন্তরে।" দূতগণের এই শুভ সংবাদ নিয়ে গীতাবলীতে বেশ কিছু গান স্থান পেয়েছে।

১২২৩ খ্রিস্টাব্দে আসিসির সাধু ফ্রান্সিস ইতালিতে যিশুর জন্মের কাহিনী শুরু করেন। এই কাহিনী ছিলো লাতিন ভাষায়- গান ও আবৃত্তি। পরে বিভিন্ন ভাষায় যিশুর জন্মের কাহিনী ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের একটি বিখ্যাত গানের কলি পোপ ফ্রান্সিস তাঁর "লাউদাতো সী" সর্বজনীন পত্রের শুরুতেই উল্লেখ করেছেন, "হে আমার প্রভু, তোমার প্রশংসা হোক।"

বড়দিনের সবচেয়ে জনপ্রিয় গানটি লিখেছেন একজন অস্ট্রিয়ান কাথলিক-ফাদার যোসেফ মহ্‌র, ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে। আর গানটি হলো Silent Night বা প্রশান্ত সে রাত্রি *(গী.ব. ৬৩৪)*। জার্মান ভাষায় রচিত এই গানটি এখন শত-শত ভাষায় রচিত এবং আজও জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে এই গানটি ব্রিটিশ এবং জার্মান সেনারা তাদের মধ্যে শান্তির বার্তা হিসেবে গাইতেন।

পাশ্চাত্য বড়দিন ঐতিহ্যে এখন Jingle Bells' একটি অতি জনপ্রিয় সঙ্গীত। এই গানটি রচনা করেছেন ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে, আমেরিকান গীতিকার জেমস লর্ড পিয়েরপন্ট। বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের মতে, এই জনপ্রিয় গানটি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর বোস্টন শহরের ওয়াশিংটন স্ট্রিটে গাইতে দেখা গেছে বলে উল্লেখ করেছেন। সেটা ছিলো বড়দিনের আড়াই মাস আগে। তাতে করে বোঝা যায় জিংগ্যাল বেল্‌স- বড়দিনকে উদ্দেশ্য ক'রে রচিত কোনো গান নয়। সঙ্গীতবিদদের মতে, জিংগ্যাল বেল্‌স হলো টমটম বা ঘোড়ার গাড়িতে ব্যবহৃত ঘোড়ার গলায় লটকানো ঘন্টার টুনটুন বা ঝুনঝুন আওয়াজ। কয়েক দশক এই গানটি খ্রিস্টানদের কাছে বড়দিনের গান হিসেবে কোনো মূল্য ছিলো না। তবে আজকের দিনে অনেক জনপ্রিয়। জেস্টের হেয়ারস্টোন রচিত ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. And man will live for evermore because of Christmas Day, গানটি বিভিন্নজনে রেকর্ড করলেও ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে Boney g. ব্যান্ড দলটি যেভাবে রেকর্ড করেছেন, বড়দিনের ইংরেজি গানের তালিকায় এখনোও শীর্ষে এবং জনপ্রিয়। এমন আরো কিছু পাশ্চাত্যের গান এদেশেও জনপ্রিয় হচ্ছে।

বড়দিনের বাংলা গানের ইতিহাস কোথায় পাওয়া যাবে জানি না। কেউ এই বিষয়ে হাত লাগিয়েছেন কিনা, তাও জানি না। আমি অপারগতা স্বীকার করেই বলছি- এই বিষয় নিয়ে কোনোদিন ভাবিনি। প্রতিবেশীর সম্পাদক ফাদার বুলবুল রিবেরু বড়দিনের সঙ্গীত নিয়ে কিছু লিখার জন্যে অনুরোধ করলে, বিষয়টি মনে ধরে। পুরো বিষয়টি গবেষকদের জন্য রেখে দিলাম।

খুব ছোটোকালে দু'টি বাংলা খ্রিস্টীয় গানের বই দেখেছিলাম। একটি হলো "পবিত্র ক্রুশ সংঘের গীতাবলী," আর অন্যটি হলো "দিনাজপুরের গানের বই।" এই দু'টি খ্রিস্টীয় গীতাবলীর প্রায় সব গানই প্রতিবেশী প্রকাশনীর গীতাবলীতে স্থান পেয়েছে। এগুলো এখন আর আলাদা করে চেনা যাবে না। মনে আছে "দিনাজপুরের গানের বইয়ে গ্রেগরীয়ান ও ল্যাটিন সুরে কিছু গান ছিলো। পূর্ববঙ্গে বাংলা খ্রিস্টীয় সংগীতের পথ প্রদর্শক হলো "একাডেমী অব ওরিয়েন্টাল মিউজিক, ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউট, বরিশাল। এখান থেকে প্রকাশিত গানের কথা ও সুর আজোও খ্রিস্টীয় সংগীতের মডেল হয়ে আছে। ওরিয়েন্টালের অনেক গানের মধ্যে দু'টি আগমনকালীন গান ইতিহাসে হারিয়ে যাবার নয়। একটি হলো, "হবে তাঁর আগমন," *(গী.ব. ৫৭৮)*। এই গানটির গীতিকার হলেন মতিলাল দাস এবং সুরকার স্যার সুশীল বাড়ৈ। আর অন্য গানটি হলো, হে বাণী স্বর্গীয়," *(গী.ব. ৫৮১)*। এই গানটির গীতিকার এবং সুরকার বার্থলোমিয় সাহা। বাণীদীপ্তি স্টুডিও থেকে ধারণকৃত 'বড়দিনের গান' এলবামে এই গান দু'টি রয়েছে। পরবর্তীতে ফাদার প্যাট্রিক গমেজ রচিত এবং সুরারোপিত, "অন্ধকারে আলো জ্বালাতে," *(গী.ব. ৫৯১)* গানটিও সারা দেশে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ-তো গেলো আগমনকালের কথা- যে গানটি না গাইলে বড়দিন মনে হয় না, সেটি

হলো, "শোন শোন শোন, শোন দুনিয়ার শ্রান্ত ক্লান্ত ব্যাথিত নর" *(গী.ব. ৬০৭)*। দ্বিজদাস কর্তৃক রচিত ও সুরারোপিত গানটি 'বড়দিনের গান' এ্যালবামের সবচেয়ে জনপ্রিয় খ্রিস্টীয় বড়দিনের গান। 'বড়দিনের গান' এ্যালবামটি ঢাকায় অবস্থিত শ্রুতি স্টুডিয়োতে ধারণ করা হয়েছিলো। বাণীদীপ্তি কর্তৃক ব্যবস্থাপনায় যতো এ্যালবাম বাজারে এসেছে- জনপ্রিয়তার দিক থেকে এখনোও 'বড়দিনের গান' এ্যালবামটি শীর্ষে। আগমন ও বড়দিনকালীন গানের জগতে 'বড়দিনের গান' মাইলফলক।

বাংলা গান ও বড়দিন সঙ্গীতকে বাংলার আনাচে-কানাচে পৌঁছে দেওয়ার পিছনে যে দু'জন ব্যক্তির নাম খ্রিস্টমণ্ডলীর সংগীত ইতিহাস থেকে হারিয়ে যাবে না- আমি শ্রদ্ধা রেখেই তাদের নাম বলছি- তারা হলেন প্রয়াত ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সীমা এবং মি. দীপক বোস। আজকে যারা এখনো সঙ্গীত নাড়াচাড়া করছেন তারা প্রায় সবাই ফাদার সীমার ছাত্র বা অনুসারী। তিনি নিজেও ছিলেন একজন গীতিকার, সুরকার এবং গায়ক। অন্যদিকে দীপক বোস সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। নিজের চোখে দেখা- সুর ও বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গতকে নিখুঁত করার জন্য মি. বোস কেমন নিষ্ঠাবান ছিলেন। খ্রিস্টীয় সঙ্গীতে বাদ্য-যন্ত্রের ব্যবহার যে কমার্শিয়াল গানের মতো নয়, তিনি তা খুব ভালো বুঝতেন। মি. বোস ছিলেন বাণীদীপ্তির সঙ্গীত পরিচালক।

আরোও অনেকে বড়দিনকে কেন্দ্র করে গানের এ্যালবাম বের করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ফ্রান্সিস বালা। মি. বালা বাণীদীপ্তি স্টুডিও থেকেই তার গান সম্পাদনা করতেন। প্রসঙ্গক্রমে সঙ্গীত শিল্পী স্যার সুশীল বাড়ৈ সম্পর্কে বলতেই হয় যে, ওনার সুরারোপিত গানগুলোর মূল ধরনই হলো খ্রিস্টীয় সঙ্গীত গোত্রভূক্ত। সুরের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা রয়েছে। তবে বড়দিনের সংগীতকে পেশাদারিত্বে নিয়ে যাওয়ার পিছনে আর একজনের নাম স্মরণ করতে হয়- তিনি হলেন নিপু গাঙ্গুলী। বাণীদীপ্তির নিয়মিত শিল্পী নিপু গাঙ্গুলীর সঙ্গীত পরিচালনায় দুটি এলবাম স্মরণীয়। পেশাদারিত্বের ছাপ রেখেছেন প্রতিটি গানের সুরে ও মিউজিক কম্পোজিশনে। নিপু গাঙ্গুলীর পরিচালনায় গোল্লা ধর্মপল্লীর প্রয়াস শিল্পীগোষ্ঠী *(সম্ভবত ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে)* 'অনন্যা এ যামিনী' ও 'প্রত্যাশা' নামে দু'টি এ্যালবাম প্রকাশ করেন। দু'টি এ্যালবামে বড়দিন ঘিরে মোট ২৫টি গান স্থান পেয়েছে। প্রাণ ছুঁয়ে যাওয়া গানগুলো গির্জায় খুব কমই পরিবেশিত হয়। এর মূল কারণ সুরের ঝংকার এবং বাণীর বিন্যাস প্রচলিত গানের ধারা থেকে আলাদা ও জটিল। এই গানগুলোতে হিন্দুস্থানী বা উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতধারা অনুসরণ করা হয়েছে।

বড়দিনের গান গির্জায় জনপ্রিয় হয়ে উঠার পাশাপাশি তা ধীরে-ধীরে বাঙালির চিরায়িত সংস্কৃতি ও উৎসবের মধ্যে মিশতে থাকে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলার শীতকালও উৎসব, আনন্দের কাল। শীতের আমেজ, নবান্ন উৎসব, গায়ের বধূ, মেঠো পথ- বাংলার এই চিরন্তন সৌন্দর্যগুলো স্থান করে নেয় বড়দিনের গানে। এই প্রসঙ্গে দু'টি গান এখানে উল্লেখ করতে চাই- একটি হলো "খুশীর বাগিচায় দোয়েল শ্যামা" *(গী.ব. ৬১১)* গানটি। "মুক্তির জয়গান" এলবামে স্থান করে নেওয়া গানটির গীতিকার ও সুরকার হলেন জনপ্রিয় নজরুল সঙ্গীত শিল্পী যোসেফ কমল রড্রিক্স। অন্য আর একটি গান এখানে উল্লেখ করতে চাই, সেটি হলো "শীত মাঝে এলো বড়দিন" *(গী.ব. ৬৬৯)* গানটি। গানটির গীতিকার হলেন উইলিয়াম অতুল এবং সুরকার, যোসেফ কমল রডিক্স। 'বড়দিনের গান' নামক এ্যালবামে গানটি রয়েছে। এই রকম আরো কিছু গান গীতাবলীতে স্থান পেয়েছে, যেগুলো বড়দিনের উৎসবকে নিয়ে গেছে বাংলার মেঠোপথে, ঘরে-ঘরে তথা সমাজের প্রচলিত সংস্কৃতিতে।

কীর্তন গান, বাংলা গানের একটা ভিন্ন ধারা। কীর্তন গান গাইবার যে উপযুক্ত ঢং, সেটা বজায় রাখতে পারলে- সব গানকে ছাড়িয়ে যায়। অবিভক্ত বাংলায় আদিকাল থেকেই মন্দিরের দেব-দেবীকে তুষ্ট করার উদ্দেশে কীর্তন গান পরিবেশন করা হতো। এখনোও আছে। সেখান থেকেই কীর্তন গান খ্রিস্টীয় সঙ্গীতে স্থান করে নেয়। একটা সময় বড়দিনকে ঘিরে কীর্তন বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছিলো। বড়দিনের মাঝরাতের খ্রিস্টযাগের পরই শুরু হতো কীর্তন। বায়েন গায়েনরা গির্জায় আসার সময়ই কীর্তনের মূল বাদ্যযন্ত্র খোল ও করতাল সঙ্গে করে নিয়ে আসতো। ঐ সময়কার জনপ্রিয় গানটি ছিলো, "ও ভাই আনন্দে যিশুর গুণ গাও রে," *(গী.ব. ৪৮৩)* গানটি। দেব-দেবীর উদ্দেশে রচিত কীর্তনগুলোর কিছু রদবদল করেও গাওয়া হতো। কীর্তন যখন দ্রুততাল বা ঝুমুর ধরতো, তখন মাঝে-মাঝে শোনা যেতো 'হরিবোল, হরিবোল।' আগেকার দিনে বাঙালি ধর্মপল্লীগুলোতে কীর্তন প্রতিযোগিতা হতো। কীর্তনদল নিজের ধর্মপল্লীর পাড়ায় পাড়ায় গান পরিবেশন শেষে অন্যান্য ধর্মপল্লীতেও ছড়িয়ে পড়তেন।

কীর্তন গানের স্বভাবটা হলো ধীরলয় থেকে ঝুমুরলয়। অর্থাৎ 'স্থায়ী' হবে ধীরলয়ের, অন্যদিকে 'অন্তরা' ও 'সঞ্চারী' ঝুমুরলয়ের বা দ্রুতলয়ের। এভাবে এক কলি গাওয়ার পর, বার-বার ফিরে আসে ধীরলয় স্থায়ীতে। গীতাবলীতে বেশ কিছু কীর্তন স্থান পেয়েছে। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি কীর্তন এখনও শোনা যায়, যেমন- আনন্দে বন্দি দীনবন্ধু *(গী.ব. ৮৩৩)*, তোমার জয় হোক *(গী.ব. ৮৩৬)*, গান দু'টিতে কীর্তনের মূলধারা বজায় রয়েছে। বেশ কয়েকটি কীর্তন গীতাবলীতে স্থান পেয়েছে যেগুলোর সুর ও লয় নামকীর্তন বা রাধা-কৃষ্ণলীলা ধাচের। এগুলোর মধ্যে অন্যতম যোসেফ কমল রড্রিক্স রচিত, আজি মহারাজা এলো ভবে *(গী.ব. ৬২৫)*, আজি ফুলে-ফুলে *(গী.ব. ৮৪০)*, আনন্দে আজ মাতোয়ারা *(গী.ব. ৮৫৫)* কীর্তনগুলো। এই কীর্তনগুলোর সুর ও বাণীর বিন্যাস এক কথায় সুমধুর। আক্ষেপ করেই বলতে হয় যে, সেই সময়টি হারিয়ে গেছে। এতো সুন্দর একটি সঙ্গীত মাধ্যম 'কীর্তন' খ্রিস্টীয় বাংলা সঙ্গীতের মূল ধারায় স্থান করে নিতে পারেনি।

খ্রিস্টীয় সংগীত শুধু উপাসনালয়ে পরিবেশনার জন্য নয়- কিন্তু উপাসনাকে জীবন্ত করে তোলা। এই গানের মধ্যদিয়ে প্রচারিত হয় খ্রিস্টের বাণী, রচিত হয় খ্রিস্টীয় সাহিত্য। তাই যুগে-যুগে এর উৎকর্ষ-সাধন অপরিহার্য। মনে হয় খ্রিস্টীয় সঙ্গীত বা বড়দিন সঙ্গীতের একটা সুবর্ণকাল আমরা পেরিয়ে এসেছি। এখন সঙ্গীত সাধনার অনেক সুযোগ তৈরি হয়েছে। খ্রিস্টান সমাজ থেকে অনেক পেশাদারি গায়ক বেরিয়ে আসছেন। কিন্তু সেই তুলনায় খ্রিস্টীয় সঙ্গীতের ভুবনটা কিন্তু আর সমৃদ্ধশালী হচ্ছে না।

"রাখালেরা যা-কিছু শুনল ও দেখল, তার জন্যে পরমেশ্বরের বন্দনা করতে করতে, তাঁর জয়গান গাইতে-গাইতে তখন ফিরে গেল।" মহামারির কারণে বড়দিন উৎসব সীমিত হলেও, বড়দিন খ্রিস্টের জন্ম-উৎসব। তাই আসুন আমরাও রাখালদের মতো গেয়ে উঠি তাঁর জয়গান। আমাদের অন্তরটাই হোক খ্রিস্ট জন্মের 'যাবপাত্র।' পাঠকদের প্রতি রইলো বড়দিনের শুভেচ্ছা॥